বৈষ্ণব কাব্যের ধারা।
PRESENTED
LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS
শ্রীশিবেন্দু নাথ গুপ্ত।

বৈষ্ণব কাব্যের ধারা

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত

পরিবেশক:
আর্ট ইউনিয়ন পাবলিকেশন
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৭০

প্রকাশক—আর্ট ইউনিয়ন পাবলিকেশন,
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—অনিল কুমার রায়
আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড,
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য—৪.৫০

উৎসর্গ—

কল্যাণীয়

স্নেহভাজন

শ্রীঅজিতকুমার রায়ের

করকমলে।

প্রকাশকের নিবেদন

বিশ্বপ্রবাহে সাধারণ মানবের মিছিল হইতে মাঝে মাঝে এক একজন মহামানব বা অবতার আসেন। তাঁহারা দেশের ও জাতির বহমান ধারা অনুগামী হইয়াই তাহার কৃষ্টি ও সাধনাকে উন্নততর পথে লইয়া যান। আমাদের মনোযোগকে উচ্চাবস্থার জীবন ও আধ্যাত্মিক অপূর্ব্ব লোকের দিকে নির্দ্দিষ্ট করেন। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন—এইরূপ এক মহামানব। শুধু তাহাই নয় তিনি ছিলেন সর্ব্বকালের সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ—শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার। আর শ্রীমতী রাধা ছিলেন তাঁহারই উপযুক্তা রমণী,—শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের-হ্লাদিনী শক্তি। তিনি প্রেমভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই দুই নরনারীর বৃন্দাবন লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব সাধক ও কবিগণ সাধনা করিয়া "রাগানুগাভক্তির" পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এই সাধক বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসই প্রধান। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে বহু গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গীতমুখর কাব্য এতই উচ্চাদর্শের যে তাহা পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ রচয়িতার লেখার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই বৈষ্ণব ইতিহাস, কাব্য, দর্শন ও সাহিত্যের একজন আসল রসিক, একজন বিশেষজ্ঞ। বৈষ্ণব ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য।

এই পুস্তকে তিনি পদাবলী সাহিত্যের রসধারার এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি পদগুলির এরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকেরও তাহার ভাবার্থ বুঝিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না।

লেখকের রসদৃষ্টি যেমন প্রখর, ভাবপ্রকাশের ভাষাও তেমনি চমৎকার, কবিধর্ম্মা, সুললিত ও সুমধুর।

লেখক অধিকাংশ স্থলে বৈষ্ণব কবিগণেরই পদ, পদাংশ, চরণ, চরণাংশ দিয়া নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন।

তিনি বৈষ্ণব কবিদের বাক্যগুলিই এমনভাবে সাজাইয়া গিয়াছেন যে তাহাতেই তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

যে চারিজন কবির কথা তিনি এই সুচিন্তিত পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন, সেই চারিজনই বৈষ্ণব সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্বরূপ। সেই চারিজনই অন্যান্য অসংখ্য বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্বরূপ। তাঁহাদের সুর্ব্বোৎকৃষ্ট পদগুলি

লইয়াই লেখক এই গ্রন্থে বিচার আলোচনা করিয়াছেন। ফলে, সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট এ আলোচনায় তাহাই উপজীব্য হইয়াছে।

সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আশা করি এই পুস্তকখানি রসিকসমাজে এবং আপামরসাধারণে সমাদৃত হইবে।

এই পুস্তকখানি B.A এবং M.A. Classএর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

এখানে বলাই বাহুল্য যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে পারায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ "সংহতি" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সুধীজন কর্ত্তৃক সমাদৃত ও উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

আর্ট ইউনিয়ন পাবলিকেশন্
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীঅজিতকুমার রায়

প্রাগ্‌ভাষ

স্বল্পাক্ষরে সারবান কিছু লিখিতে হইলে বিদগ্ধজনের ও শিরঃপীড়া হয়—বিশেষতঃ যে-বিষয়ে লিখিতে হইবে তাহা যদি এমন গভীর-গুহানিহিত হয় যে, তাহাতে, 'পণ্ডিতে লাগে ধন্দ'। সম্প্রতি আমাদের লিখিতে হইবে 'বৈষ্ণব কাব্যের ধারা'র মুখবন্ধ,—যাহার মূলভিত্তি বৈষ্ণব দর্শন,—যাহা গভীর, দুরবগাহ, বাচ্যাতিশায়ী এবং অনির্বচনীয়। যাহার অচিন্তনীয়ত্ব স্বীকার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ' স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর ভাষায় বলি :—'ক্বাহং মন্দমতিঃ ক্বেদং মন্থনং ক্ষীরবারিধেঃ।
কিং তত্র পরমাণু র্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ'॥
তথাপি স্থান এবং কাল স্বল্প জানিয়া,—সেই কাব্যের ধারা পান করিয়া তৃপ্তির উদ্‌গারের মত দু-একটী কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ গ্রন্থকারের কথা। গ্রন্থকার শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈষ্ণব সাহিত্যে নবাগত নহেন। তাঁহার রচিত 'বৈষ্ণব কবিতার রস' সুধীজনের মনোরঞ্জন করিয়াছে এবং পদাবলীপাঠক ও গবেষকগণের, তথা ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং কিয়ৎপরিমাণে কৌতূহল চরিতার্থ করিতেও সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার 'আজিও যায় তারা' 'রূপ হইতে রূপে' প্রভৃতি সুলিখিত উপন্যাসগুলি পাঠকপাঠিকাগণের সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থখানি সম্বন্ধেও ততোধিক সমাদর কাব্যকোবিদগণের নিকট আশা করিতেছি।

এই গ্রন্থের পদগুলি আমরা কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে বিভিন্ন 'পালা কীর্তনে' উদ্‌গীত হইতে শুনি,—তাঁহারা ঘরানা আঁখরের সাহায্যে এই রসঘন রচনাগুলি ব্যাখ্যা করিয়া অধিকতর উপভোগ্য করিয়া পরিবেশন করেন—সুরের ইন্দ্রজালে ভাবের জগৎ সৃষ্টি করিয়া, বাংলার প্রখ্যাত রসকীর্তনের মাধ্যমে।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহার বিষয়বস্তুগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। 'বৈষ্ণব কবিতার পটভূমি'তে—ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, ও গোপালতাপনী উপনিষৎ প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্মত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বকথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। নরাকারাকারিত পুরুষোত্তম ও পরমা প্রকৃতিই পদাবলী সাহিত্যের প্রেমাধার। "বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে কতকটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিবার মানসে, এইদুই পূর্ণ মানব মানবীর মধ্য দিয়া বিবিধ প্রেম বৈচিত্র্যের

বর্ণনা করিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণই গীতার 'পুরুষোত্তম,'—তিনি 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ':—'অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্'। এবং শ্রীরাধা তাঁহার স্বরূপ শক্তি পরমানন্দময়ী 'হ্লাদিনী'। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলাকথা যে অলৌকিক হইলেও লৌকিকবৎ হইবে তাহা বেদান্তসূত্রে ও বলা হইয়াছে—

"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্"—। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানুষের ধর্মে'ও বলিয়াছেন যে উপনিষদের যে 'ভূমা' তাহাও 'মানবিক ভূমা'ই হইবে। কারণ সে ভূমার মাপকাঠি বা মাপিবার unit তো মানুষেরই স্বাভাবিক ধর্ম। বৈষ্ণব কবিতায় পাই—

"চীর চন্দন উরে হার না দেলা
সো অব গিরি নদী আঁতর ভেলা।"

লৌকিক কবিতাতেও তাই :—

হারোনারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥"

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি,—দিই তাই
প্রিয়জনে,—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে,—আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা॥"

বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রতিভূ করিয়া তাঁহাকে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ও অন্তঃকরণের রম্য বৃত্তি সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। দেবর্ষি নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রেও তাহাই বলিয়াছেন—

"তদর্পিতা খিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্"—ইহার দ্বারা—সহজেই রিপুষড়্ বর্গের উর্দ্ধ্বপাতন বা sublimation হয়। অপরপক্ষে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা—'কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং প্রাক্শরীর বিমোক্ষণাৎ' সহ্য করা—বড়ই ক্লেশকর। তাই গীতা বলেন,—

ক্লেশোঽধিকরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্,
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (১২।৫)

বৃন্দাবনের—এই অপ্রাকৃত দিব্যপ্রেমকে,—প্রাকৃতপ্রেমের সম্পর্কলেশ মাত্র পরিহারপূর্বক—'কামগন্ধহীন' করিয়া 'নিকষিত হেম'রূপে পরিবেশন করেন পরমবৈরাগী পরমপ্রেমিক শ্রীমন্মহাপ্রভু, যিনি বলিতেন 'সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ। হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ॥" তাই

শ্রীনরহরি ঠাকুর বলিয়াছেন—"যদি গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে।।

মধুর বৃন্দাবিপিনমাধুরী প্রবেশ চাতুরীসার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার।।"

তাই দেখি মহাপ্রভু,--

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস-আস্বাদন।
বহিরঙ্গসঙ্গে করে নাম-সঙ্কীর্তন।।"

আজকাল অনধিকারী শ্রোতৃবর্গ যখন কামকণ্ডূয়নের জন্য লীলাকীর্তনের উজ্জ্বলরসের পদাবলী শুনিয়া নানাবিধ কদর্য জৈব মন্তব্য করেন তখন তাঁহারা নিজেদের কলুষিত চিত্তেরই পরিচয় দিয়া থাকেন।

পরমভাগবত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন,—"শত শত সতী চিতায় পুড়িয়া যে ছাই হইয়াছে,—সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল সতী ও নায়িকা হব্যস্বরূপ,—কিন্তু যখন সেই হব্য হোমাগ্নির আহুতি হয়—তখন তাহার নাম হয়—'রাধা ভাব'। "

এই প্রসঙ্গে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা'র উত্তরাংশ 'ঠাকুরাণীর কথা' (মোহিতলালের সংস্করণ) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য বলিয়া মনে করি।

দক্ষিণে আড়বার ভক্তগণের সঙ্গীতধারায়, উত্তরে জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গীতি কবিতায় ও সর্বোপরি 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমের বন্যায়—বঙ্গ বিহার উত্তরপ্রদেশ উৎকল এবং দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ভাসিয়াছিল—সেই প্রেমমহোদধির মন্থনোদ্ভূত অমৃতরসপানের পর রসোদ্‌গার এই পদাবলী সাহিত্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখি,—রাধিকা—'সর্বস্ত্রীরূপধারিণী'—'ত্বং কলাংশ কলয়া বিশ্বেষু সর্বঘোষিতঃ'। চণ্ডীতেও তাই "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। তাৎপর্য্য এই যে রাধিকা সমস্ত আরাধিকার সমস্ত ঈশ্বর-প্রেমিকার,—কৃষ্ণ-দয়িতার প্রতীক বা প্রতিভূ,—type বা symbol,—এই প্রেমলীলায় পুরুষোত্তমই একমাত্র পুরুষ এবং ভক্তমাত্রেই রমণী। গীতাতেও (৭।৫ শ্লোকে)—জীবমাত্রেই জীবভূতা পরাপ্রকৃতির অন্তর্গত এবং পুরুষ একমাত্র পুরুষোত্তম—(গীতা ১৫।১৮–১৯) পা‌শ্চাত্ত্য মরমী ভক্ত F. W. Newman ও এই কথাই বলিয়াছেন,—"If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become a woman—yes, however manly you may be among men." St John of the cross প্রার্থনা করেন,—"Please Thee unite me to Thyself, making my soul Thy bride."

লেখকের 'বৈষ্ণব কাব্যের ধারার' বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, মান, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পদাবলী, বিভিন্ন কবির রচনায় কিরূপ ভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা তুলনামূলকভাবে অনেকস্থানে লেখক তুলিয়া দেখাইয়া তাঁহার বিদগ্ধ রসিক মনের পরিচয় দিয়াছেন এবং পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহার তারতম্য নির্ণয়ের সুযোগ দিয়াছেন। "বৈষ্ণব কাব্যধারা বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান ঝরণাধারা" এ কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন এবং শুধু স্বীকার নহে ইহাতে অবগাহন স্নান করিয়া, ইহার পীযূষ ধারা পান করিয়া তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'র অঞ্জলি ভরিয়া বিশ্ব সাহিত্যকে দান করিয়াছেন—গ্রন্থকার তাহাও বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার তাঁহার সময়ের অল্পতার জন্য দ্রুত মুদ্রাঙ্কণ করিতে বাধ্য হওয়ায় নূতন পুরাতন বানান পদ্ধতির নানা বৈষম্য ঘটিয়াছে আশা করি তাহা পরবর্তী সংস্করণে দূর করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীগণ এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

বিনয়াবনত—
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বৈষ্ণব কবিতার পটভূমি

বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবন, আজিও বর্ত্তমান। আবার মানবহৃদয়ে এই বৃন্দাবনের স্থিতি,—একথাও তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই বৃন্দাবনভূমি—সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের লীলা-স্থলী, আনন্দময়, স্বপ্নমাধুরীর দেশ। ইহা চিন্ময়। তাঁহারা বলেন ভৌগোলিক বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে এমন একটি রসময়ী আবেষ্টনী সৃষ্ট হইয়া আছে যে যে-কোন ভক্ত সাধক সেখানে গিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলামাহাত্ম্য অনুধ্যান করিলেই এই চিন্ময় বৃন্দাবনের সন্ধান লাভ করিতে পারেন।

এইসব সাধক কবিগণ রাধাকৃষ্ণের রসলীলা এই চিন্ময় বৃন্দাবনে চাক্ষুষ দর্শন করিয়াছেন। এই মিলনলীলা নিত্যকাল ধরিয়া চলিতেছে। ইহাই সেই ভাগবতকথিত নিত্যলীলা।

এই কাব্যের নায়ক নররূপধারী শ্রীকৃষ্ণ, আবার অখিল রসামৃত স্বয়ং শ্রীভগবান। নায়িকা—নারী দেহধারিণী শ্রীরাধা আবার মহাভাব স্বরূপিনী ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি।

গোপ গোপীগণ—শুদ্ধসত্ব সরল মানব মানবী, আবার মায়াকলিত বিগ্রহ সব।

পশুপক্ষী তরুলতা পুষ্প ফল স্থাবর জঙ্গম, যদিও বাস্তব, অবাস্তবের স্বপ্নাচ্ছাদিত।—সকলই মায়াময়।

বিষয়—বেদান্তের "অবাঙ মনসোগোচরম"কে রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শের নিবিড় পরিবেষ্টনে আনিয়া রূপবান করিয়া রসঘন প্রকাশে প্রেমরসলীলাকে বাণীরূপ প্রদান করা।

শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত লীলাময়ের চির সত্যোজ্জ্বল, শাশ্বত প্রতীক, ইহা সকল সাধকই স্বীকার করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে ভিত্তি করিয়া চিরসুন্দরের এই প্রেম রসলীলা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

একথা সত্য যে বৈষ্ণব কাব্যের নায়ক নায়িকা—রাধাকৃষ্ণ, মূলতঃ রূপক কল্পনা, তাঁহাদের লীলা বৈচিত্র্য ও রূপক সৃষ্টি এবং লীলাভূমি বৃন্দাবন, গোপ-গোপী সকলই রূপক।

তবে ইহাও বলিতে হইবে যে রাধাকৃষ্ণ, আহেরিয়া গোপগোপীগণ,—শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, নন্দ, যশোদা, চন্দ্রাবলী—শুধুই কল্পনা নহে—এ সকলের অস্তিত্ব ছিল। ইহা একপ্রকার ঐতিহাসিক সত্য।

বৈষ্ণব কবিগণ এই ঐতিহাসিক রাধাকৃষ্ণ চরিত কথা রচনা করেন নাই সত্য তবে বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা কাব্যের উপাদান সমূহ, নাম, ধাম প্রভৃতি এইসব হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বাস্তবের উপর কাব্যের ভিত্তি করিলেও তাঁহারা প্রধানতঃ রূপক নির্দ্দেশ করিয়াই তাঁহাদের কাব্যকে গ্রথিত করিয়াছেন।

---বাস্তব ও অবাস্তবে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতে, সসীম ও অসীমে একটা মিলনসেতু বন্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র রূপ ও রসকে মিলাইয়া তত্ত্বকে পরিমূর্ত্তি দিয়াছে। এই সৃষ্টি রচনার চতুর্থস্তরে যে শ্যাম ও পীত জ্যোতির্ধারার মিলনস্পন্দন জ্ঞান সাধকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই তাঁহারা রূপকভাবে রূপ ও রসের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ ও রাধার যুগলরূপ আখ্যা দিয়াছেন। তাই কৃষ্ণের বর্ণ শ্যাম ও রাধার বর্ণ পীত।

এই পীত জ্যোতির্ধারাকেই উপনিষদ হৈমবতী "উমা" বলিয়াছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র "হ্লাদিনী শক্তি" বলিয়াছে। শ্যামজ্যোতিকে বেষ্টন করিয়া পীত জ্যোতির্ধারা চক্রাবর্ত্তবৎ প্রতিভাত হয়। শ্যামজ্যোতিকে ঘিরিয়া পীতজ্যোতির এই যে আবর্ত্তন ইহাই রাসচক্রের নর্ত্তন। প্রোটনকে ঘিরিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে ইলেকট্রন-সমূহ যেমন করিয়া নর্ত্তন করিতে করিতে ঘুরিতে থাকে চক্রাকারে, বিপুল এক স্বতঃস্ফুর্ত্ত প্রেমের আকর্ষণে, তাহারই মত এই নর্ত্তন। বৈষ্ণব শাস্ত্র এই পীতধারাকে "গোপী" ও শ্যামজ্যোতির্ধারাকে "রাসেশ্বর" বলিয়াছেন এবং ইহাতে যে মহাধ্বনি উত্থিত হয় তাহাই শ্যামের "বংশীধ্বনি"। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই স্থানকেই "রাসমণ্ডল বা নিত্যবৃন্দাবন" বলিয়াছেন।

শাক্তরা ইহাকেই "সহস্রারস্থ মহাপদ্ম" বলেন। এই স্থানই আনন্দদেশ। —ভক্তিশাস্ত্র কথিত "প্রেমময়ধাম"।—বেদপ্রতিপাদিত সপ্তব্যাহৃতির চতুর্থ ব্যাহৃতি—"মহোলোক"।

ঋষিরা সৃষ্টি রচনায় সাতটি স্তর পরিকল্পনা করিয়াছেন।—

মলিনমায়া, শুদ্ধমায়া, মুক্তদেশ, আনন্দদেশ, সত্যদেশ, চিন্ময়দেশ ও নিত্যদেশ। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহোলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

ব্রহ্মাণ্ডের মত মানবদেহেও এই স্তরভাগ বিদ্যমান।

সুতরাং আনন্দদেশ বা নিত্যবৃন্দাবন মানবের নিজের মধ্যেও অবস্থিত।

বৈষ্ণব সাধক কবিকুল এই মনোবৃন্দাবনে রাধাশ্যামের নিত্যলীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইতেন। তাঁহারা বলেন—রাধাকৃষ্ণ একই মৃণাল হইতে উদ্‌গত একটি পীত একটি নীল পদ্মের মত নিত্য মিলিত।

বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মের মূলে যে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব নিহিত আছে—তাহারই সঙ্গীতময় কাব্যরূপ পদাবলী সাহিত্য। ঐ তত্ত্ব সমগ্র পদাবলীর মধ্যে নিহিত। ইহাই পদাবলীকে মিষ্টিক কবিতায় পরিণত করিতে সহায়তা করিয়াছে ও আধ্যাত্মিক কাব্যের রূপ দিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন বৈচিত্র্যের প্রভাব ত আছেই।

ইহার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ রক্ত মাংসের মানুষ হইলেও স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম।

নায়িকা শ্রীরাধা লাবণ্যময়ী নারী মাত্র নহেন, ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি। —পরাশক্তি বা পরাপ্রকৃতি।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে সম্পর্ক, বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের সহিত এই পদাবলীর সেই সম্পর্ক। কাব্যরসের দিক দিয়া প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র হইলেও আধ্যাত্মিক দিক হইতে প্রত্যেক পদই ঐ লীলাতত্ত্বের পরিপোষক।

বৈষ্ণব কবিগণ পদাবলী রচনা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান ও শ্রীরাধা যে সেই অখিল নায়কের পরাশক্তি এই মূলীভূত তত্ত্বটি কদাপি বিস্মৃত হন নাই।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে নিত্যকাল ধরিয়া যে চিরন্তনলীলা চলিতেছে, তাঁহারা এই দুই বাস্তব নরনারীকে তাহার শরীরী রূপক করিয়াছেন। প্রকৃত রাধাকৃষ্ণ কাহিনী না লিখিয়া, কল্পনায়, ভাবে, বর্ণে, চিত্রে তাঁহারা এই মনো-বৃন্দাবনে হৃদয়দেবতার যে অরূপ প্রেমলীলা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই ইঁহাদের উপর আরোপ করিয়াছেন। সাধারণ ইন্দ্রিয়বোধের বহু উর্দ্ধে এই লীলা। এই অপরূপ লীলাকথা ভাষায় বুঝাইবার নহে। বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে কতকটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার মানসে এই দুই পূর্ণ মানবমানবীর মধ্য দিয়া বিবিধ প্রেমবৈচিত্র্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের কাব্যের নায়ক নায়িকা রাধাকৃষ্ণের প্রেমচিত্র "দীন মর্ত্তবাসী এই নরনারীর প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের তপ্ত প্রেমতৃষার ভিতর দিয়া স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়া ক্রমে তাহার সীমা ছাড়াইয়া এক শাশ্বত, আধ্যাত্মিক প্রেমচিত্রে পরিণত হইয়াছে। মানবলীলার অসমাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া গিয়া তাহা অবিনাশী সুসমাপ্তির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্ব্বরাগ, মিলন, অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য, মান, বিরহ, মাথুর ও পুনর্মিলনের ভিতর দিয়া তাহা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া এক অতিলৌকিক প্রেমকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই কাব্যে প্রাকৃত প্রেমের সকল বিভাব, অনুভাব ও সকল লীলাবৈচিত্র্যের কথা আছে কিন্তু সবই যেন অপ্রাকৃত বর্ণে অভিরঞ্জিত।

ইহাতে নরনারীর প্রেমের প্রাকৃতভাব যতই থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা আমরা যতই অস্বীকার করি না কেন, বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য

যতই প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন না কেন, লীলাক্ষেত্রটা যে বাস্তব বৃন্দাবন ছাড়াইয়া অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের কথা মনে জাগাইয়া দেয়, গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র নয়, বংশী বা মুরলীধ্বনিটা যে সাধারণ রাখালিয়া বাঁশের বাঁশির তান মাত্র নয়,—একথা ভুলিবার উপায় নাই।

বৃন্দাবন যে শুধু পার্থিব মাটি নয়—ইহা যে স্বপ্নলোক, কল্পলোক, মায়া-লোক। ইহা যেন মানস অলকাপুরী। ইহার অধিবাসী কেবলমাত্র রক্তমাংসের দেহধারী জীব নয়। তরুলতা, পশুপক্ষী, জড় চেতন, সবই যেন এক অলৌকিক স্বপ্ন-মাধুরীতে রঞ্জিত। স্বপ্নবিহ্বলতাই যেন এই আবেষ্টনীর মূল ধর্ম্ম।

কৃষ্ণ যে মানুষ ছাড়াও আরও কিছু,—তিনি যে অতিমানব একথা যেন বার বার মনে উদয় হয়।

শ্রীরাধা যে সামান্য নারী নহেন, মহাযোগিনী একথা ভোলা যায় না। ভাবস্বপ্নের আবেষ্টনীর মাঝে এই বৃন্দাবন লীলা, শুধু মানবহৃদয় লইয়া ইহার কারবার।

এই কাব্যের পদগুলিকে প্রকৃতপক্ষে মিষ্টিক বলা চলে না, তবু মিষ্টিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণবসমাজ, বৈষ্ণবসাধন, বৈষ্ণব ঐতিহ্যধারা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রীচৈতন্যদেবের ভাগবত জীবনের লীলাবৈচিত্র্য ইঁহাদের কাব্যে এই mysticism আরোপ করিয়াছে।

বৈষ্ণব পরাতত্ত্ব, বৈষ্ণব সাধকতা, সাধকমণ্ডলীর আবেষ্টনী ও এই কবিগণের ভাগবতজীবন এই কাব্যকে লোকোত্তরতা দান করিয়াছে।

এই রসসাধক মহাপ্রেমিক কবিগণ দিব্যনেত্রে শ্রীবৃন্দাবনলীলা, মধুর ব্রজরসকেলি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, অতিলৌকিক ভাবরসে বিভোর হইয়া, দিব্যোন্মাদে, ছন্দে সুরে চিত্রে, রাগরাগিণীতে, নানাবৈচিত্র্যে তাহা ভাষায় প্রকট করিয়াছেন। ইহা অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয়। ইহা শুধুই ধ্যানগম্য। তাই শাস্ত্রকার ঋষি বলিয়াছেন—"ধ্যায়েৎ বৃন্দাবনং রম্য"। এই অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়, ধ্যানগম্য লীলাকে তাঁহারা রূপ দিয়াছেন।

রসঘন লীলামূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া একটা মহতী রসানুভতির অভিব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিত দিয়া তাঁহারা আপামর সাধারণের উপলব্ধির জন্য এই মহালীলাকে বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মানবীয় স্নেহ, প্রেম, অনুরাগ, সখ্য, বিরহ প্রভৃতির মধ্য দিয়াই লইয়া গিয়া একটা বৈশিষ্ট্যের আকার দান করিয়াছেন।

একান্ত লৌকিক ভাব ও ভাষায় রচনা করিয়াও ইহার মধ্যে তাঁহারা এমন একটা অতীন্দ্রিয় সুর নিহিত করিয়াছেন, যাহা শুনিতে শুনিতে সাধারণ শ্রোতারও চিত্ত দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমের উদ্দেশে চলিয়া যায়। এই অতীন্দ্রিয় মিষ্টিক সুর কতকটা এই কবিদের লেখনীর কৃতিত্ব, কতকটা আরোপিত। শ্রীচৈতন্যদেব এই পদাবলীতে অতিলৌকিক ব্রহ্মরস সমারোপ করিয়া গিয়াছেন। তিনি "গম্ভীরা" মন্দিরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া এই কাব্যের লীলারহস্য সমাস্বাদন করিতেন। এইরূপ ভজনপ্রণালীতে যে অনির্ব্বচনীয় ভাগবতী মাধুরীর উপলব্ধি ঘটে, তাহা বহু বৈষ্ণব সাধক প্রত্যক্ষদর্শী হইয়া বলিয়া গিয়াছেন। এই অলৌকিক অমৃতময় মহাকাব্যের অন্তরালে কত যে উচ্চ রস সুধাধারা প্রবাহিত তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবৈচিত্র্যে পরিলক্ষিত হয়।

এই রসমধুর ব্রজলীলা রূপায়িত হয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মধ্যে।

কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য, শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম তাঁহার মাঝে প্রকটিত হয়। শ্রীরাধার হৃদয়বিদারী আর্ত্তি, ক্রন্দন, বিলাপ যেমন তাঁহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, মাধুর্য্য, রসবিকার তাঁহার দেহে, মনে ও অন্তরসত্তায় ফুটিয়া উঠে।

এই কৃষ্ণ—"সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ, অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণম্", আর শ্রীরাধা স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী।

রস আস্বাদনের এই শাশ্বতলীলা হয় অপ্রাকৃত ব্রজে।

ইঁহাদের বিরহে মিলনের রসস্ফুর্ত্তি হয়, মিলনের পর আবার বিরহে বাড়ে তার তীব্রতা। লীলার ধারা এমনিভাবে অনন্তকালের বুকে বিপুল বিশ্বে বহিয়া চলে।

রাধাপ্রেমে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ জীবন এই লীলারই বিরহে মিলনে উদ্বেলিত।

অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম সাধারণ মানুষের চক্ষে ছিল অমর্ত্ত। তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠে শ্রীচৈতন্যের মহাজীবনে।

রাধা কৃষ্ণশক্তি। রাধাকে স্থাপন করা হয় সাধ্যসাররূপে। এই রাধাকৃষ্ণ প্রেম বড় মধুর—"রতিরানন্দরূপৈব।" ইহাই হ্লাদিনীবৃত্তি।

নিত্যব্রজরসের রসিক এই কবিগণের মনোবৃন্দাবনে, যেখানে একমাত্র রাগাত্মিক কৃষ্ণপ্রেমের রাজত্ব, না জানি কবে কোন্ শুভলগ্নে রসিকশেখর সেখানে আসিয়া রাসোৎসব করিয়াছেন। সেদিনও কি গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন রজনীর ন্যায় শারদীয়া রাত্রি ছিল? তাঁহাদের সহিত সেদিনও তাই কি—

"ভগবানপিতারাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

সেই লীলার মধুর স্মৃতিই কি পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে ?

বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণের আরাধ্য ধন শুধু ভাব-কল্পনার বস্তু নহেন, বেদান্তের ব্রহ্ম নহেন, সাংখ্যের পুরুষ নহেন,—প্রেমভক্তিমার্গের স-রূপ, স-গুণ নিত্যসত্তা। বৈষ্ণব কবিকুল এই রূপকে, এই রূপবানের লীলাকে অন্তর্লোকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বেদান্তের "অবাঙমনসোগোচরম" বৈষ্ণব সাধনায় আসিয়া প্রত্যক্ষ রসঘনরূপ ধরিয়াছেন। তাই তিনি কেবলমাত্র ধ্যানধারণার ধন নহেন, পরন্তু বৈষ্ণবের "হৃদিরাসমন্দিরে" প্রেমময়রূপে অধিষ্ঠিত এবং ভক্তের সহিত লীলায় আত্মহারা। তাই পদাবলী সাহিত্যে যে সকল ভাবস্ফুর্ত্তি হইয়াছে তাহা শুধুই কাব্য নহে, আধ্যাত্মিক সাধনতন্ত্রও। তাঁহাদের এই কাব্য কেবলমাত্র গীত নহে, ইহা প্রেমধর্ম্মের গীতা রূপধর্ম্মের সাধনবাণী। ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্যভাবসৌন্দর্য্য ও ব্রহ্মস্বাদসহোদর রস ছাড়াও নিগূঢ় ব্রহ্মস্বাদেরই ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধনপথে অন্তর্লোকের যে পরম গূঢ় ভাবদ্বন্দ্ব সাধকের চিত্তে অনুভূত হয় তাহাও এই কাব্যে রূপলাভ করিয়াছে।

যে প্রেমভক্তির কথা এই কাব্যে রূপায়িত তাহার বীজমন্ত্র আমরা নারদীয় পঞ্চদশী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও শ্রীভাগবতে পাই। সেখানে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার কথা বর্ণিত আছে। তাহারই বাণীরূপ আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণবকাব্যের শ্রীরাধাশ্যামের বৃন্দাবনলীলায়।

ভাগবদধর্ম্মের বীজমন্ত্র প্রেমভক্তির, চরম অনুশীলন ইহাতে অনুষ্ঠিত। শ্রীরাধা এই প্রেমভক্তির মূর্ত্ত ছবি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে তিনি সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া একেবারে কৃষ্ণময়ী হইয়াছেন। তিনি শ্যামের সহিত অভেদাত্মিকা। কৃষ্ণরাধার যে দেহভেদ তাহা শুধু মধুর রস আস্বাদনের নিমিত্ত।

"রাধাকৃষ্ণ যৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।"

ইহাই প্রেমধর্ম্মের বিশেষত্ব।—পৃথকভাবে নিজ সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করা।

প্রেমপথিক বহির্জগৎকে জ্ঞানপথিকের ন্যায় মায়াময় বলিয়া অস্বীকার করেন না। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় থাকিয়া বাহিরের জগৎকে ভুলিয়া যান। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দময়। সেই আনন্দ হইতে তাঁহার অন্তরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের উদ্ভব হয়। এই মধুরভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ সেবাই প্রেমসাধনার পূর্ণপরিণতি। শ্রীরাধা ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রকারেরা বলেন—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনীশক্তি। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই কৃষ্ণ কানু সাজিয়া বৃন্দাবনে বেণুহস্তে এত রসময় লীলা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এত আপনজনের মত হইতে পারিয়াছেন।—রাখালরূপে গরু চরাইয়াছেন, যশোদার

শাসন, নন্দের বাধা, শ্রীদাম, সুদাম, সুবলের দৌরাত্ম্য, ব্রজগোপীগণের অভিযোগ, সবই সহ্য করিয়াছেন। মানিনী রাইয়ের মান ভাঙ্গাইতে স্বয়ং অখিলেশ্বর হইয়াও পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিবর্জ্জিত সরল, সহজ প্রেমভক্তির তিনি এমনি বশীভূত যে এই সব করিতে তিনি এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, বরং আনন্দই পাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের যে মিলন হইয়াছিল, শাস্ত্রকার তাহা প্রাকৃত বা মানবীয় নহে বলেন। তাহা কামগন্ধহীন। "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" হইয়া তিনি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রকার বলেন—যোগমায়ার সহায়তা ব্যতিরেকে রসিকশেখর লীলা করিতে পারেন না। প্রকৃতি ভিন্ন শিব শবরূপেই অবস্থান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মাঝে হ্লাদিনীশক্তিই শ্রীরাধা। শ্রীমতীর আবির্ভাব না হইলে এই প্রেমলীলার রসাস্বাদ জগত পাইত না। রাধাতত্ত্ব কোনো দিন বুঝিত না।

কৃষ্ণরাধার এই লীলা অপূর্ব্ব, অচিন্ত্যনীয়। যাহা দেখিয়া মহেশ্বরও বিমুগ্ধ। তিনি মদনকে দহন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই লীলায় কৃষ্ণ মদনকে মোহন করেন। তাই মহাদেব-মদনদহন, শ্যামসুন্দর-মদনমোহন।

এখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ঈশ্বর ও শ্রীরাধিকাকে তাঁহার আত্মোপলব্ধিস্বরূপা হ্লাদিনীশক্তি এই মূলতত্ত্ব যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে কৃষ্ণের বহুবল্লভতা ও পরকীয়া প্রেমকে সামাজিক আদর্শের বিষয়ীভূত করা চলে না। ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। সাধারণ মানবের পক্ষে স্বকীয়া, পরকীয়া আছে, স্বয়ং ব্রহ্মের পক্ষে পরকীয়া বলিয়া কিছুই নাই।

তাহা ছাড়া স্বকীয়ার রূপকের দ্বারা পরিপূর্ণ আত্মহারা ব্রহ্মানুরাগ প্রকাশ করা যায় না। সেজন্যও বৈষ্ণব কবিগণ পরকীয়ার প্রতীক ও রূপক গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্বকে লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে লৌকিক অনুরাগের পরাকাষ্ঠা যাহাতে প্রকাশ হয় তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পরকীয়াবাদের সাহায্যে ব্যাকুলতার তীব্রতা গূঢ়তা ও গাঢ়তা ঘটাইবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

তাঁহাদের শ্রীরাধিকা এই পরকীয়া প্রেম-অনুরাগের চিরন্তন অভিসারিকা। তাঁহার প্রেমপ্রদীপ দেহ, মন ও আত্মার সমগ্রতার সম্মিলনে সমুজ্জ্বল হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রেমভক্তিপথের পথিকের ইহাই চিরকাম্য, ইহাই তাহার চরম ও পরম পরিণতি। ভক্তের ভগবানে আত্মবিসর্জ্জন।

এই বৈষ্ণব কাব্যে পরাতত্ত্ব এমন গভীরভাবে নিহিত আছে যে পদাবলীর প্রেমলীলা, সামাজিক নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ বিরুদ্ধ হইলেও, চিরপ্রচলিত

নৈতিক আদর্শের প্রতিকূল হইলেও, এ দেশের লোকের কাছে অসঙ্গত বা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় নাই। তাহার কারণ লোকের মন বৈষ্ণব সাধনার পরিবেশে পরাতত্ত্বের রসে এমনি অভিসিঞ্চিত যে আচারবিরোধী বন্ধনহীনতা, ও স্বাধীনতাকে তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভগবান ও তাঁহার আত্মোপলব্ধি শক্তির প্রতীক কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলায় ইহাই সঙ্গত ভাবিতে তাহাদের বেগ পাইতে হয় নাই।

এই কাব্যকে যদি সম্যক বুঝিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত Background‌কে অনুধ্যান করিতে হইবে। প্রাকৃত কাব্য হইতে এই কাব্য স্বতন্ত্র। অতীন্দ্রিয়ভাবলোকে চিত্ত উন্নীত না হইলে এই কাব্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। এই ভাবের ভাবুক হওয়া চাই।

যাঁহারা এসব মানিতে অপারগ, সকল তত্ত্বকথা, বৈষ্ণবধর্ম্ম, ঐতিহ্য, বৈষ্ণব সাধকতা বাদ দিয়াও যদি শুধু কাব্য হিসাবেই তাঁহারা পদাবলী সাহিত্য পাঠ করেন, কীর্ত্তনগান শ্রবণ করেন তাহাতেও দেখিবেন—এই কাব্যে এমন একটা অতুলনীয় আন্তরিকতা, তন্ময়তা ও নির্ম্মল প্রগাঢ় কবিত্ব ও সুরের মাধুরী আছে যাহা কেবল শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাতেই সম্ভব।

—কি রচনার পরিপাট্য, কি প্রাণের আবেগ, কি স্বাভাবিক গতির উচ্ছ্বাস, কি অলঙ্কারধ্বনি, বস্তুধ্বনি, শব্দধ্বনি—সকল দিক দিয়াই ইহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছিবার উপযুক্ত।

মনের ভাবরূপ যখন রেখায় অঙ্কিত হয় তখন তাহা হয় চিত্র। উপমাভূয়িষ্ঠা বর্ণনায় সেই চিত্র ফোটানো যায়। কথা ছন্দে গ্রথিত হইলে হয় পদ ও সুরের মূর্চ্ছনায় তরঙ্গায়িত হইলে হয় সঙ্গীত। প্রকৃত কাব্যে এই সবের মিলন দেখা যায়। বৈষ্ণবকাব্যে এই তিনেরই সম্মিলন ঘটিয়াছে।

ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা কাব্যের প্রাণ, ভাব ও রস তাহার আত্মা, শব্দলালিত্য ও ছন্দগৌরব তাহার দেহলাবণ্য এবং উপমাদি অলঙ্কার তাহার ভূষণ।

বৈষ্ণবকাব্যে এসবের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, সব মিলিয়া ইহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব Symphony, Harmony ও চমৎকারিত্বের স্থষ্টি করিয়াছে। ইহাই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আসন দিয়াছে। ইঁহাদের কাব্যে সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের প্রেমিকপ্রেমিকার সকল স্তরের প্রেমানুভূতির রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেমের গভীর আকুলতা, আত্মবিস্মরণ, আর্ত্তি আত্মত্যাগ প্রেমের এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বৈচিত্র্য বোধকরি জগতের কোনো সাহিত্যে এতাদৃশ বাণীরূপ লাভ করে নাই।

ইহার সার্ব্বজনীন আবেদন ও অভিব্যক্তিই ইহাকে চিরন্তনতা দান করিয়াছে। সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ইহা ত'

শুধু প্রেমের গান নয়। ইহার একটা আধ্যাত্মিক স্বরূপ আছে। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই তবে পদাবলী সাহিত্যের রসানুভূতি সম্যক হইবে।

ইঁহাদের এই কাব্যের ভাষাও অপূর্ব্ব। শিশুর মুখের বাণীর মত,—আধ, আধ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কাঠিন্যশূন্য, কলমধুর, সুললিত ও সুমধুর। চিরসুন্দরের মাধুর্য্যের ছবি আঁকিতে ইহার চেয়ে উপযোগী ভাষা আর হইতে পারে না। ইহা অর্দ্ধস্ফুট লাবণ্যময়ী ফুলের মত।

এই কাব্যের পদগুলিও যেন অর্দ্ধবিকশিত।—সুগায়কের কণ্ঠে হয় পূর্ণ প্রস্ফুটিত। গায়ক তাঁহার সুসঙ্গত আঁখর সংযোগে গানগুলিকে দেন পূর্ণাঙ্গরূপ। তাঁহার আঁখরে ভাব বিশ্লেষিত হইয়া শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিভূত করে।

পদগুলি যেন শ্লোকের মত, সীমাবদ্ধ।—গায়কের সুরের ধারায় হয় সীমাহারা।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"ইহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন।"

কাব্য, কথা, চিত্র ও সঙ্গীতরসের সহিত আধ্যাত্মিক সাধনার এমন একাত্মকতা বোধ করি বিশ্বসাহিত্যে আর নাই।

ইঁহাদের রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা,—কাব্যের দিক হইতে আত্মহারা অমর "প্রেমের কাহিনী"।

—সাধনার দিক হইতে ইহাই মধুর "রাগানুগা ভক্তি।"

—ভাগবতবর্ণিত প্রেমভক্তি ভাবের রসময়ী বাণীরূপ।

বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে, কাব্যশিল্প কুশলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, সসীম ও অসীমের সম্মিলনরূপ মিলনসেতু বন্ধন করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল কবি, সাধক ও সমালোচকের একটি পরম বিস্ময় হইয়া বিরাজ করিবে।

এখানে বলিয়া রাখি বৈষ্ণব কবিগণ ভগবানের প্রেমলীলার অনুধ্যানকেই শ্রেষ্ঠ সাধনভজন মনে করিতেন, তাই তাঁহারা প্রেমের বিবিধ লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহারা সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। পদাবলীর কবিরা এই লীলার সখী, সহচরী বা দূতীর ভাবে নিজেদেরও অঙ্গীভূত করিয়াছেন ও এই ভজন-সাধনকেই কাব্যে বাঙ্ময় রূপ দিয়াছেন।

সর্ব্বজীব ও সর্ব্বভূতের অস্তিত্ব যে মহাচৈতন্যে বিধৃত, বৈষ্ণব কবিগুরুদের তাহারই সহিত অন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা কৃষ্ণসহচররূপে রাধাকৃষ্ণ লীলায় অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুর রসের সাধনার পূর্ব্বে ভয়মিশ্রিত ভক্তির সাধনা প্রচলিত ছিল। যে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের দিব্যজ্যোতিতে চরাচর উদ্ভাসিত, যিনি "সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ", সেই বিশ্বাত্মার প্রতি একটা ভয়ভক্তির পূজা চলিয়া আসিতেছিল। ভগবান এখানে "মহেশ, রাজাধিরাজ বিশ্বের প্রভু",—"সখা, দয়িত, প্রিয়তম", পরম আত্মীয় নন। এই ভয়ভক্তিকে প্রেমে রূপান্তর করা সম্ভব হইয়াছে বৈষ্ণব সাধনায়। নির্ব্বিশেষকে বিশেষের মধ্যে ধারণা করিতে, ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে, আত্মীয়রূপে চিন্তা করিতে পূর্ব্বসাধকদের বাধিয়াছে। অসীম, অনন্তকে বুঝি ছোট করা হইল ইহাই ছিল তাঁহাদের ধারণা। তাই ত তাঁহারা ছোট বড়র পার্থক্য রাখিয়া দূর হইতে সসম্ভ্রম ভক্তি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।

অথচ এই ভক্তিকে উর্দ্ধতন সাধনায়—প্রেমের সাধনায় উন্নীত করিতে হইলে নিবিড় ব্যক্তিসম্বন্ধ অতি আবশ্যক।—রসসাধনার ইহাই প্রতিষ্ঠাভূমি। তাই বৈষ্ণব সাধনায় কৃষ্ণ "আত্মারাম" হইয়াও দ্বিভূজ মুরলীধররূপে ব্রজগোপীগণের সহিত লীলা আকাঙ্ক্ষায় অবতীর্ণ। "ররাম ভগবাংস্তাভিঃ আত্মারামোহপি-লীলয়া" অবশ্য এ প্রেম পার্থিব নয়। ইহা "তিলে তিলে নূতন হোয়"। ইহাতে অবসাদ আনে না।

নির্ব্বিশেষ পরমতত্ত্ব নয়, ঐশ্বর্য্যময় ভগবান নয়—রসস্বরূপ, মাধুর্য্যময় ইহাদের ভগবান।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন--"মাধুর্য্যভগবর্ত্তাসার"। শ্রীভগবান অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যেরই অনুগত। তাই তিনি শাস্তিদাতা নন, তাঁহাকে ভয় করিবার কিছুই নাই। তিনি পরম করুণাময় ও পরম প্রেমিক।

"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব।" মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করা তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার কাজ।

তাই তিনি দ্বিভূজ হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন ও মানবজাতির সহিত প্রেম-লীলায় রত হইয়া কর্ত্তব্য সাধন করেন।

রাসলীলা জীবনের শাশ্বত সত্য। জীবের সহিত ঈশ্বরের সনাতন সম্বন্ধ ইহাতে রূপায়িত।

এই ব্যক্তি-সম্বন্ধের জন্যই বৈষ্ণব পদগুলিতে আকুলতা, অকূলতা ও আবেগের অন্তর্মুখিনতা এত গাঢ় ও গূঢ় হইতে পারিয়াছে। এই রূপের গূঢ়তার জন্যই পদাবলী অনন্যসাধারণ।

ব্যক্তি সম্বন্ধ গড়িয়া না উঠিলে প্রেমের গাঢ়তা ঘটে না।

"চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সে অব গিরিনদী আঁতর ভেলা।।"

"আমার বধূয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া।" ইত্যাদি পদে যে আবেগ, যে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধে ফুটিতে পারে না। এই প্রতীক রূপায়ণের মাধ্যমে নির্বিশেষ যে ভাবে আপনাকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে, নির্বিশেষ রূপে তেমন হয়না। অন্যান্য কারণ ছাড়াও জীবাত্মা ও পরমাত্মার, সীমা ও অসীমের নিবিড়তম মিলন চিত্র দেখাইতে বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ নির্বিশেষকে বিশেষ রূপ দিয়াছেন। এবং নির্বিশেষের এই বিশেষ রূপ "কৃষ্ণকে" ঘিরিয়া তাঁহাদের তথা মানব হৃদয়ের সমুদয় আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষা ও তৃষা—মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই বৈষ্ণব কবি ও সাধকদের মূল কথা—ঈশ্বরপ্রেম এবং ঈশ্বর বিরহ। এই প্রেম ও বিরহই তাহাদের দৃষ্টিতে পরমসত্য। তাঁহাদের মতে ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য বিরহ-ব্যাকুল হয়, ভগবানও তেমনি ভক্তের সঙ্গে মিলনের জন্য বিরহ-বিধুর হন। তিনি ভক্তের সঙ্গে মিলিতে আপনিই আসেন। কৃষ্ণ-রূপে আসিয়া তিনি একদা গোপীগণের সহিত রাসোৎসব করেন। মনের মণিকোঠায় প্রেমময় স্বামীর সহিত চলিয়াছিল আহেরিয়া রমণীগণের রসলীলা। শ্যামসুন্দর বনমালী মনমালী হইয়া একদা লীলাবিলাস করেন এই কবি ও সাধক গণেরও হৃদি উপবনে। তাঁহাদের কায়া-ফুলবনে রসরাজ রাসোৎসবে ছিলেন একদিন বিরাজিত। অন্তরকুঞ্জে রাসলীলার এই রসমাধুর্য্যে তাঁহারা ছিলেন বিভোর। এবং সেই তন্ময়তাই রূপ পাইয়াছে পদাবলী সাহিত্যে।

বৈষ্ণব কাব্যের ধারা

বৈষ্ণব কাব্যের ধারা প্রধানতঃ বেদনার। এই কাব্যের সমগ্রতার ধারাবাহিকতায় একটা গভীর বেদনার সুর অন্তর্নিহিত। বেদনার-যমুনা-কূলে যে চিরন্তন লীলা চলিতেছে, সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে, সেই লীলার গানের ধারাই বৈষ্ণবকাব্যে প্রবাহিত। বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী এই নিত্যলীলার গানই গাহিয়াছেন।

ইহাকে যাঁহারা কামনার গান বলেন, ইহার মধ্যে যাঁহারা বিলাসকলা ও লালসাসুখের চিত্রই শুধু দেখেন, ইহা শুধু প্রমোদ, উল্লাস ও রাগলীলার সাহিত্য বলিয়াই মনে করেন, তাঁহাদের চোখে উপরটুকুই পড়ে বলিতে হইবে।

একথা সত্য পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গাররসলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে অশ্লীলতা দেখা যায়, প্রকৃত কামলীলা বৈচিত্র্যের যথেষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র কাব্য লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই এই যে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস ইহা পরিণামে পরিপূর্ণ করুণরসে পরিণত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই,—পদাবলী সাহিত্য যাহা কাব্য, সঙ্গীত, ধর্ম্ম ও দর্শনের মিলন চিত্র তাহাতে এত সম্ভোগের বর্ণনা কেন? ইহার নায়িকা শ্রীরাধিকা ত' ভোগবিলাসিনী নন, তিনি যোগিনী। চণ্ডীদাস বলেন—"মহাযোগিনীর পারা"। তবে তাঁহাকে লইয়া এত রাগলীলার কথা কেন? ঈশ্বর বিরহের গভীরতা দেখাইবার জন্য কি? ইহা কোন গূঢ় সাধনার অঙ্গ। ইহার মূলে কি কোনো দার্শনিক তথ্য ও ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে?

বহু বৈষ্ণব কবি শুধু কবিই ছিলেন না, তাঁহারা সাধকও ছিলেন। অনেকে ব্রহ্মচারী ছিলেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী বৈরাগী হইয়াও তাঁহারা যেভাবে রাগলীলার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা সহজিয়া পরকীয়া রাগানুগা ভক্তি সাধন পন্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াই মনে হয়।

ধর্ম্মের সহিত ইহার কোনো গভীর সম্পর্ক আছে, এবং ইহার মূলে একটা দার্শনিক তথ্যও নিহিত।

ইহাতে সুখ, উল্লাস কোথায়! পদাবলীর আদ্যন্ত বেদনারই কাহিনী।

অনুরাগ, অভিসার, মান, মিলন, বিরহ, মাথুর,—সমস্তই বেদনার করুণ-গানে ভরা। শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া অবধি রাধারাণীর মনে স্বস্তি নাই, শান্তি নাই।

অনুরাগ

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস পঘন কদম্ব কাননে চায়।।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি ভূষণ খসিয়া পড়ে।। — চণ্ডীদাস

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে যেমন যোগিনীপারা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নের তারা।। — চণ্ডীদাস

"হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি কেন বা এমন কৈল?
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে বধির করিল বাঁশি।
সব পরিহরি করিল বাউরী মানয়ে যেমন দাসী।।
কুলের করম ধৈরয ধরম সরম মরম ফাঁসী।।" — চণ্ডীদাস

রাধার অন্তরে এই যে হাহাকার ইহা একদিনের তরেও থামে নাই। বর্ষার ঘোর দুর্য্যোগময়ী নিশীথে রাই চলেন অভিসারে।

অভিসার

"মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার।।
ঝলকত দামিনী দশদিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি।।" — জ্ঞানদাস

"ভীম ভুজঙ্গম সরণা। কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা।।
গগন সঘন মহীপঙ্কা। বিঝিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা।।
দশদিশ ঘন আন্ধিয়ারা। চলইতে খলই লখই নহি পারা।।" — বিদ্যাপতি

কিন্তু এত সঙ্কটের ভিতর দিয়া এই সঘন নিশীথে আসিয়াও বাঞ্ছিতের দেখা মিলিল না।

"এত করি আইলিহুঁ জীব উপেখি।
এই সোও না ভেল মোহে মাধব দেখি।।" — বিদ্যাপতি

শ্রীরাধিকার মনে উদ্বেগ, আকুলতা, প্রতীক্ষার বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

মান অভিমানের লীলায়ও গভীর বেদনা।

মান।

"অবনতবয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহ শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি।।
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
অভরণ তেজল ঝাপল বেশ।।
নীরস অরুণ কমলবর নয়নী।
নয়ন লোরে বহি যাওত ধরণী।।" — বিদ্যাপতি

অভিমানিনীর নয়ন কমল ছাপাইয়া বেদনার অশ্রুধারা বহিয়া যায়।

মিলনেও শঙ্কাজড়িত বেদনা।—বিচ্ছেদের ভয়। একটা অতৃপ্তি, একটা অশান্তি প্রাণে, ফুলের মালার কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়া যায়। হারাই হারাই ভাব। মিলনের মাধুর্য্য হারাণোর শঙ্কায় অশ্রুসজল।

মিলন।

"প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে।"

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥" চণ্ডীদাস

প্রেমবৈচিত্ত্যের মাঝেও আছে মিলনের মধ্যে বিষাদ। ভুজপাশে থাকিয়াও যেন বাধা।

"আঁচলক হেম আঁচলে রহু, যৈছন খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি।"

মিলনের মধ্যেও একটা হাহাকার।

বিরহের গানগুলির ত' কথাই নাই,—গভীর কারুণ্যেভরা—বেদনাঘন। বিরহে রাইয়ের হাস্য, লাস্য, বিলাস, ছলনা, গতিভঙ্গী, চাহনির বঙ্কিম কটাক্ষ,—সকলই গিয়াছে। শিশির মথিতা পদ্মিনীর মত মলিনা রাই। শ্যাম বিনা আজি সকলই শূণ্য।

বিরহ।

"অব মথুরাপুর মাধব গেল। গোকুল মাণিক কে হরি লেল॥
গোকুল উছলল করুণাক রোল। নয়নক জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥"

"শূণ ভেল মন্দির, শূণ ভেল নগরী।
শূণ ভেল দশদিশ শূণ ভেল সগরী॥"

"কৈসন যাওব যমুনাতীর। কৈসে নিহারব কুঞ্জকুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলবারী। কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি॥"

"হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈসে মালতীক মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥" বিদ্যাপতি

মাথুর—সেত' বেদনার চরম প্রকাশ। বেদনার সকল স্রোতোধারা যেন এক মহাব্যথাসাগরে আসিয়া মিলিয়াছে।

"কালি বলি কালা গেল মধুপুর সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাটা তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানি নারীর যৌবন গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব যৌবন মেলা ভার॥

যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল ভ্রমরা উড়িয়ে গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঁয়ানু বঁধূ নাহি ফিরে এল॥
বঁধু নাহি ফিরে এল।
এ নব যৌবন পরশ রতন কাঁচের সমান ভেল॥" চণ্ডীদাস

জীবন থাকিলে একদিন শবরীর মত তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যৌবন গেলে একবার, শ্যামকে পাওয়া গেলেও আর সে ফিরিয়া আসিবে না।

ব্যর্থ যৌবনের এই যে হাহাকার—জগতের সাহিত্যে অমর।

"এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগী হেন সদাই ধেয়োয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না পড়ে কেন নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখিহে বড় দুখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া এই বিধি লিখল করমে॥"
গোবিন্দদাস

কাল কালান্তরে, দেশদেশান্তরে যে সকল রাসোৎসব, যে সমুদয় লীলাবিলাস, যে সব সুখস্বপ্ন অকালে ভাঙ্গিয়া যায়; যে সমস্ত সুখ নিকেতন, যে সকল গৃহ সংসার শ্মশানে পরিণত হয়; কত প্রেমমালঞ্চ ক্ষণে ক্ষণে শুকাইয়া যায়;—তাহাদের সকল ব্যথা বেদনা শোকঘন হইয়া এই মাথুর গানে সুরে সুরে সজ্জিত হইয়া আছে।

জীবনের মরুপথে হারানো গান, হারানো সুর, হারানো স্বপ্নবিহ্বলতার স্মৃতির বেদনার রূপায়ণ—এই মাথুর।

এমন কি ভাবসম্মিলনের উল্লাস, উচ্ছ্বাসও গভীর কারুণ্যের নামান্তর।

ভাবসম্মিলন—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হোত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলেত ভাল॥
এসব দুঃখ কিছু না গণি। তোমার কুশলে কুশল মানি॥" চণ্ডীদাস

আনন্দের মাঝেও বেদনার কি গূঢ়গভীর প্রকাশ!

পদাবলী সাহিত্য মধুর রসের রচনা। কিন্তু তাহার ভিতর একটা দৈন্যঘন কারুণ্য রসধারা প্রবাহিত।

এই কারুণ্য মানব সংসারের শোক দুঃখ ব্যথা, ব্যর্থপ্রেম জনিত লৌকিক কারুণ্যই শুধু নয়, পরম আত্মীয় বা আত্মীয়াকে অকালে হারানোর বেদনাই শুধু নয়, নানা প্রয়াস, প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই শোক দুঃখ ব্যথা, এই প্রেমের ব্যর্থতা. এই

অকাল হারানো, রোধ করিতে না পারার যে অসহায়তা মরজীবের—ইহা সেই কারুণ্য।

মানব জীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, রিক্ততা, সসীমতা, অতৃপ্তি, অস্বস্তি, অশক্তির বেদনাই—এই কারুণ্য।

পূর্ণকে অপূণ, অসীমকে সসীম, নিত্যকে অনিত্য হৃদয়ে পাইয়াও যে ধরিয়া রাখিতে পারে না,—এই যে অক্ষমতা, এই যে দৈন্য মরজীবের—ইহারই আক্ষেপ—এই কারুণ্য।

বৈষ্ণবকবির শ্রীরাধা—এই কারুণ্যের মূর্ত্তরূপ।

রাই বলেন—

"চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব গিরিনদী আঁতর ভেলা।"

যাহার সহিত ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে বলিয়া বুকে বসন, চন্দন, হার পর্য্যন্ত রাখি নাই আজ তাহার সঙ্গে গিরিনদীর ব্যবধান হইয়া গেল।

এত করিয়াও তিনি শ্যামসুন্দরকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই।

এই যে অসহায়তা, এই যে অক্ষমতা—ইহাই সেই কারুণ্য।

এই কারুণ্যে—মিলনে ও বিচ্ছেদচিন্তায় রাধাশ্যাম—"দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে" বিরহে শ্রীরাধার অন্তরে হাহাকারের আগুন জ্বলে।

এই অতিলৌকিক কারুণ্যধারাই বৈষ্ণব কাব্যের রাগলীলার গানগুলিকে বিধৌত করিয়া, বেদনা-যমুনাজলে স্নাত করাইয়া নির্ম্মল, পূত করিয়া দিয়াছে। এই কারুণ্যধারা লৌকিকের ভিতর দিয়া বাহিয়া অলৌকিক পথে, ভূলোক ছাড়াইয়া দ্যুলোকের দিকে প্রধাবিত। ইহার এই ঊর্দ্ধমুখী অসীমের দিকে গতিই পদাবলীকে এতটা মহত্ব দিয়াছে।

এই পদাবলীর কাব্যধারায় মূলতঃ মানব হৃদয়ে নিত্যের জন্য যে চিরন্তন ব্যাকুলতা, অজানা অনন্তের জন্য যে শাশ্বত আগ্রহ, তাহারই গভীরতম আকুতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। মানব-হিয়ার "চিরবিরহিনী ক্রন্দসী" মূর্ত্তি এই কাব্যের প্রধান উপাদান। তাই ইহা চিরন্তন। কখনও রূপান্তর বা লুপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই কাব্য মানব অন্তরের গূঢ়তম রসসম্পদকে অঙ্কিত করিয়া ধরিয়াছে ছন্দে, সুরে, সঙ্গীতে বাণীরূপ দান করিয়াছে। তাই আপামর সাধারণ সকলেরই ইহা উপভোগ্য।

এই কাব্যে মানব হৃদয়ের সমুদয় মাধুর্য্য, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, সারল্য, যেন শ্যামসুন্দরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আর তাহার ব্যথা, বেদনা, বিরহ, আর্ত্তি, আকুলতা, আশা আকাঙ্ক্ষা, শাশ্বত পিপাসা —সব মিলিয়া রাধারাণীর বিগ্রহ গড়িয়াছে।

এই কাব্যে রাইয়ের অন্তর দিয়া নিখিল মানব-হিয়ার আকুতি ও আর্ত্তনাদ, প্রাণের সকরুণ হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। রাধা যেন যুগযুগান্তরের, দেশ দেশান্তরের মানবের প্রাণের গূঢ় বেদনা নিজ অন্তরে ধরিয়া রহিয়াছে। দেশকালাতীত, সার্ব্বজনীন মানব-মনোবৃন্দাবনে এই শ্রীরাধা অধিষ্ঠিত,—তাই ইহার বিলুপ্তির কোনোদিন আশঙ্কা নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,--

"আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো যে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা সারানিশি সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।।"

এই কাব্যধারায় নরনারীর প্রাকৃত অনুরাগ, মিলন, সম্ভোগ, রসোৎসবের প্রবাহের মধ্যেই বৈরাগ্য, অতিপ্রাকৃত বিরহ, সম্ভোগশূন্যতা, সর্ব্বস্ববিসর্জ্জন, সর্ব্বসংস্কারমুক্তি, অহমিকাবর্জ্জনের একটা ফল্গুধারা বহিয়া চলিয়াছে, এবং কারুণ্য রসধারার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া জীবাত্মার অজানা অনন্তের জন্য ব্যাকুলতার কথাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। মানব অন্তরে যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা ও অস্বাতন্ত্রতার বেদনা এবং প্রাকৃত ভালবাসার উর্দ্ধে যে অতিলৌকিক প্রেমের তৃষ্ণা, তাহারই গানের কলধারা ইহাতে চিরপ্রবহমানা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"ইহা সেই মোহমন্ত্রগান যাহা কবির গভীর প্রাণে চিরবিরহের ভাবনা জাগাইয়া তোলে।"

অজানা অনন্তের তৃষ্ণাকে বিশ্বকবি মানবাত্মার "চিরবিরহিনী নারী" বলিয়াছেন—

"কহিলাম তারে তুমি চাও কারে ওগো বিরহিনী নারী?
সে কহিল আমি চাই যারে তার নাম না কহিতে পারি।"

বিশ্বকবির এই "বিরহিনী নারী"ই বৈষ্ণব কাব্যের শ্রীরাধা।

তাঁহার আর্ত্তি, বিরহের বেদনা এতই গভীর যে তাহা লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ—"সে কথা কহিবার নয়।" শুধু অনুভব করিবার।

রস, ব্যঞ্জনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ—সকল দিক দিয়া বৈষ্ণব কবিগণের যে সব পদ লোকোত্তরতা লাভ করিয়াছে, তাহাদের রচনাশৈলীর মধ্যেও এই "বিরহিনী নারী"র অন্তরের কারুণ্যধারা অনাবিল গতিতে বহমান।

কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধরণ করিয়া দেখাই ইঁহাদের রচনা কিরূপ রসঘন কারুণ্যে সিঞ্চিত।

১। "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।।"

কবিবল্লভ

চরমপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে মিলনেও তৃপ্তি নাই। রাইয়ের মুখ দিয়া মানব-হিয়ার সেই প্রগাঢ় অতৃপ্তির কারুণ্য ধ্বনিত।

২। "সখিহে হমর দুখক নহি ওর রে।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর রে।।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভনহুঁ শেখর কৈসে গোঁওয়াযো হরি বিনু দিনরাতিয়া।।"

কবিশেখর

রাধাহৃদয়ের এই যে হাহাকার গগনের হাহাকারের মধ্য দিয়া কারুণ্যধারায় যেন বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

৩। "কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি।।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।"

চণ্ডীদাস

শ্রীরাধার আক্ষেপের কারুণ্যে নিখিল বিশ্বের সকল উপেক্ষিতার হৃদয়ের যুগ যুগান্তরের বিলাপধারা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৪। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥" জ্ঞানদাস

এখানে রাধার অন্তরের তথা বিশ্ববাসীর হিয়ার চিরজাগ্রত পিপাসা—Eternal yearning কারুণ্যরসে সিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মানবাত্মা যাহার অংশ সেই পূর্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যেন হাহাকার করিতেছে।

জ্ঞানদাসের এই প্রসিদ্ধ পদটি রবীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট সনেটকে মনে পড়াইয়া দেয়।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে,
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে,
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে,
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে,
চিরদিন তীরে বসি করিলো ক্রন্দন।
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে,
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহমন চির রাত্রিদিন,
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

৫। "মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামলবরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝিঁ ঝিনি ঝিনি বাজে ডাহুকী সে গরজে স্বপন দেখিনু হেনকালে॥
জ্ঞানদাস

এই কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন—"অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা।

রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন--এ--স্বপন দেখিনু হেনকালে।--

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন্ একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসা কুঁড়িধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে। চোখে কাজলপরা,

ঘাট থেকে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নাই। আছে শাওন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

কিন্তু হায়! এ সুখস্বপ্নও নিদ্রাভঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়। "জাগিয়ে হইনু হারা।" স্বপ্নভঙ্গে নির্ম্মম বাস্তব সত্য প্রকাশ পায়। কারুণ্যের ধারা বহিয়া চলে।

"পরাণ বঁধূকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেসর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।
পরশ করিতে রস উপজিল জাগিয়ে হইনু হারা।। — চণ্ডীদাস

৬। "রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি যে করে প্রাণ।।" — জ্ঞানদাস

এখানে অনলঙ্কৃত ভাষায় রাধার হৃদয়ের গভীর কারুণ্যের কি চমৎকার প্রকাশ!

যুগে যুগে মানবজাতির অন্তরে যে দুঃখ, বেদনা, হাহাকার–প্রাকৃত, অপ্রাকৃত প্রেমের জন্য উপচিত, সঞ্চিত হইয়াছে, বৈষ্ণব কাব্যধারায় তাহাই ছন্দ লীলায় বহিয়া চলিয়াছে। নরনারীরচিত্তে যুগে যুগান্তরে যে রূপতৃষ্ণা, রূপানুরাগ, মিলনলিপ্সা, জাগরূক, তাহাই এই কাব্যের অনুরাগ, মিলন, বিরহাদির মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে একান্ত করুণ রসে সিক্ত হইয়া, সমাজ সংসারের গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লৌকিক সীমা ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক লোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। লৌকিক গণ্ডীর মধ্যে এই প্রেমের গানগুলির স্থিতি হইলেও উহাদের মূর্চ্ছনা তরঙ্গ অতিলৌকিক রসলোকের অনির্ব্বচনীয়তায় গিয়া মিশিয়াছে।

বৈষ্ণব কাব্যের নানা ভাবদ্বন্দ্বে দিশেহারা রাধা নিখিল বিশ্বের সকল রাধার প্রেমাহত জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ইহার বিরহের গানগুলিতে এই নিদারুণ প্রেমের ব্যর্থতারই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাথুরে তাহার চরম অভিব্যক্তি।

এই মাথুর নরনারীর জীবনে এক দিন না একদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবনের সন্ধ্যায় রূপ, রস, বর্ণময় পৃথিবী হইতে অসীম বৈরাগ্যব্যথায়, মন যখন বিমুখ হয়, নানা আঘাতে, নানা ব্যর্থতায় প্রাণ যখন গেরুয়া রঙে রঙীন হইয়া উঠে, তখন বৈষ্ণবকাব্যের ধারার সার্থক তাৎপর্য্য মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়। বহির্বিশ্বের সমস্ত আনন্দ উপকরণকে দূরে ঠেলিয়া অন্তরের নির্জ্জনতায় এই কাব্যের ধারার স্বরূপটুকু একান্ত করিয়া বোঝা যায়। কাল, যুগধর্ম্ম, জীবন ও মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই ধারার কারুণ্যরসটুকু মানুষের মনকে

অভিসিঞ্চিত করে। মানব জীবনের যৌবনই—বৃন্দাবন, বার্দ্ধক্যই—মথুরা বা মাথুর। যৌবনের অবসানে—

> "নৈরাশ্যে হৃদয় ভরে, শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে, লইয়াছে বিদায় যৌবন,
> শ্যাম গেছে মথুরায়, প্রাণ করে হায় হায়, অন্ধকার মোর বৃন্দাবন।"
>
> কালিদাস রায়

বৈষ্ণব কাব্যধারা মানবাত্মার বিরহ ধারারই বাণীরূপ। পূর্ণের সহিত জীবাত্মার যে বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদ বেদনার সাহিত্য রূপ। কারুণ্যই ইহার মূল ধারা। ইহার প্রধান ঝরণাধারা।

"বৈষ্ণব কাব্যধারা বঙ্গসাহিত্যের প্রধান ঝরণাধারা—"। একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন।

তাই নানা বৈচিত্র্য, নানা রস রাগের ভিতর দিয়া আজ বাংলা ভাষার গদ্যে, পদ্যে, নাটক, কাব্য, উপন্যাসে যে বিচিত্র ভাবস্রোত প্রবহমান তাহার সার্থক, লোকোত্তর রচনাগুলিতেও এই কারুণ্যের ফল্গুধারা বিরাজমান।

রূপ ও অনুরাগ

রূপ দেয় প্রেরণা, রূপশ্রী যোগায় উপকরণ, রূপমাধুরী জাগায় অনুরাগ। কিন্তু সে কেমন রূপ,—যে রূপের প্রতি চিরসুন্দরেরও জাগে অনুরাগ!

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস এই রূপকে বর্ণন করিতে গিয়া বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের কথা উপমাচ্ছলে উল্লেখ করিয়াছেন। যে রূপলাবণ্যে শ্যামসুন্দর আত্মবিস্মৃত, সেই লাবণ্যের কথা বলিতে গিয়া তাঁহারা অলঙ্কারের ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

চিরলাবণ্যময়ী শ্রীরাধিকার রূপশ্রী বর্ণন করিতে গিয়া বিদ্যাপতি বলেন,—

"কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বরভয়ে কোকিল গতিভয়ে গজ বনবাসে॥"

গোবিন্দদাস লেখেন,—

"চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পণ্ডার। বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার॥"

বিদ্যাপতি লিখিলেন,—

"যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই। তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ। তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ॥
যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ। তঁহি তঁহি কমল পরকাশ॥
যঁহা লহু হাস সঞ্চার। তঁহি তঁহি অমিয় বিকার॥
যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ। তঁহি তঁহি মদন শর লাখ॥

গোবিন্দদাস বলিতেছেন,—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ যুগ চলই। তাঁহা তাঁহা থল কমলদল খলই॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল। তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥

বিদ্যাপতি গাহিলেন,—

"করিবর রাজহংসী জিনি গামিনী চললিহ সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িতদণ্ড হেমমঞ্জরী জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
উরুযুগ কদলী করিবর কর জিনি স্থলপঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িম বীজ ইন্দু রতন জিনি পিকজিনি অমিয় বাণী॥"

গোবিন্দদাস গাহেন,—

"আনন হেম সরোরুহ ভাগ। সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলল পাশ ॥
নয়ন যুগল নীল উৎপল জোর। সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস। পরিমলে জিতল অমরতরু বাস ॥
বান্ধুলী মিলিত অধর যাহা হাস। দশনহি কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুটে চম্পক সম গোরা। পাণিকতল থল কমল উজোরা ॥"

জ্ঞানদাস রাইয়ের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন,—

"ঢল ঢল কষিত কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরি ॥"
"বয়ন শরদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।
মনমথ মথন অলপদিঠি বঙ্ক ॥"

"কমল নয়ন কনক কাঁতি। মুকুতা নিকর দশন পাঁতি ॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম ভুল। কাজরে সাজল দিঠি দুকূল ॥"
"চললি হরিণনয়নী রাই। ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই ॥"

চণ্ডীদাসও রূপবর্ণনায় অপর বৈষ্ণব কবিগণের মতই বহুস্থলে উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যেন তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় নাই, তাই রূপমুগ্ধতার গভীরতাকে তিনি ইঙ্গিত ব্যঞ্জনার দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ হসিত বদনে চায়।"
"নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল ॥"

তাঁহার কৃষ্ণ বলেন,—

"গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।
সেই হতে মোর হিয়া নয় থির মনমথ জ্বরে ভোর ॥"

শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিতে গিয়া বিদ্যাপতি বলেন,—

"অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসনপরা সৌদামিনী রেহ ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কাজরে সাজল মদন সুবেশ ॥"
"বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ। তাপর কীর থির করুবাস ॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়। তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোড় ॥"

তাঁহার রাই বলেন,—এরূপ দেখিয়া আঁখি ফিরাইতে পারিলাম না।

গোবিন্দদাস বলেন—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরছা পায় ॥"

তাঁহার রাই কহেন,—

"কিবা সে নাগর কিখেনে দেখিনু ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে।।"

জ্ঞানদাস বলেন,—

"শ্যাম চিকণিয়া দে রসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দামিনী।
ভুবনবিজিত ঠাম দেখিয়ে কাঁপয়ে কাম
কান্দে কত কুলের কামিনী।।"
"অতি অপরূপ শ্যাম কালি চিকণিয়া। অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া।।

চণ্ডীদাস বলেন,—

"নয়ন কমল অতি নিরমল তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি যেনবা দিয়াছে দেখা।।"

তাঁহার রাধা বলেন,—

"সই চাহনি মোহিনী থোর।
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল রূপের নাহিক ওর।।"
"সই কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া মরমে রহিল পশি।।"
বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন মোহন লখিয়া নাহিক লখি।।"

রাধাশ্যামের রূপ বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিকুল সকল প্রচলিত conventionকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

চিত্রের পর চিত্রে, মোহন তুলিকাপাতে, অপরূপ উপমা প্রয়োগে, বিদ্যাপতি নায়কনায়িকার পূর্ব্বরাগ অনুরাগের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

তাঁহার কৃষ্ণ রাধিকাকে দেখিলেন—কমলমুখে অমৃত ঝরিতেছে, রক্তাধরে কুন্দকুসুমের মত দন্তরাজি।

"অমিয়ক লহরী বস অরবিন্দ।
বিদ্রুম পল্লব ফুলল কুন্দ।"

মাধব কহেন—গোধূলি বেলায় রাইকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিলাম যেন নবজলধরে বিদ্যুৎ রেখার দ্বন্দ্ব প্রসার করিয়া গেল।

"যব গোধূলি সময় বেলী। ধনি মন্দির বাহর ভেলী।।
নব জলধর বিজুরি রেহা। দন্দ পসারিয় গেলি।।"

মেঘ প্রচ্ছদপট, তাহার উপর বিদ্যুন্নিভ রাইয়ের মূর্ত্তি। বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া ক্ষণিকে বিলীন হয়, কিন্তু এই তড়িৎলতা ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ বলেন,—

সুন্দর ধবল নয়ন তার কাজর রঞ্জিত,—যেন বিমল কমলে মধুপ মেলা।

"কাজর রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভ্রমর মিলল জনি বিমল কমলপর।।"

মুখ নাড়িয়া সে হাসিয়া কথা কয়, যেন শরতের পূর্ণিমার চাঁদ অমৃত বর্ষণ করে।

"আনন লোলএ বচন বোলএ হসি।
অমিয় বরিখ জনি শরদ পূণিম শশী।।"

সে কি অপরূপ রূপ! যাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের,—

"নিমিখ নিবারি রহল দুনয়না।"

তিনি চলিতে চাহেন কিন্তু,—

চলইতে চাহি চরণ নাহি যায়।"

কৃষ্ণ বলেন তবু ভাল করিয়া সম্পূর্ণ তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

"আধ বদন হেরি লোচন আধ।
দেখিব কিয়ে অরু পুনু ভেল সাধ।।"

কিন্তু মেঘে বিদ্যুতের মত চকিতে নীলাঞ্চলে সে মুখশশী আবৃত করিল।

"মেঘ বিজুরি জইসে উগি নুকি গেলা।"

সানন্দবদন, চঞ্চল নয়ন যুগল তাহার, যেন নীল পদ্মে কেহ চন্দ্রপূজা করিতেছে।

"লোচন চপল বদন সানন্দ।
নীল নলিনীদলে পূজল চন্দ।।"

অলক্ষ্যে আমাকে দেখিয়া হাসিল সে, যেন রজনী জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল হইল।

"অলখিতে হম হেরি বিহসলি থোর।
জনি রজনী ভেল চাঁদ উজোর।।"

লজ্জায় ধনি দুই হাত জোড় করিয়া সুন্দর মুখকমলখানি ঢাকিল, কাম কি চাঁপাফুল দিয়া চাঁদের পূজা করিল?—

"জোরি ভুজযুগ মোরি বেড়ল ততহি সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল যৈসে শারদ চন্দ।।"

কৃষ্ণ বলেন—এত রূপ যাহার তাহার প্রতি কাহার না নয়ন যায়!

"তভহি ধাওল দুহু লোচন রে যতহি গেলি বরনারী॥"

কৃষ্ণ আর তাহাকে ভুলিতে পারিলেন না, অনুরাগের বহ্নি জ্বলিল অন্তরে। তিনি বলেন—

"মেঘমালাসঞ্জে তড়িৎ লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

চিরসুন্দর এই কিশোরের অনুরাগের সাথে সাথে চিরসুন্দরী কিশোরীর অন্তরেও অনুরাগের আগুন জ্বলিল।

রাই বলেন,—

শ্যামকে দেখিলাম আর আঁখি ফিরাইতে নারিলাম।

"মোর মনমৃগ মরম বেধল বিষম বাণ বেয়াধে।"

মধুমত্ত ভ্রমর কি উড়িতে পারে? শুধু পক্ষপ্রসারণ করে।

"মধুক মাতল উড়য় ন পারয় তই অও পসারয় পাঁখা।"

কানুর বচন শ্রুতিকুহরে পশিয়া আমার চিত্তকে উন্মত্ত করিল, তাহার দর্শনে আঁখি মুগ্ধ হইল, যেন চন্দ্রোদয়ে আত্মহারা চকোর বন্দী হইল।

"শুনি চিত উমত দেখি আঁখি ভোর।
চাঁদ উয়ে বন্দী রহল চকোর॥"

রাই বলেন,—এখন ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও যে ভোলা যায় না তাহাকে।

"যত বিসরিয় তত নিসর ন যাই।"

এইরূপে তাঁহার প্রথম অনুরাগের চিত্তচাঞ্চল্য সুরু হইল।

তিনি বলেন,—

"কি কহি কি শুনি কুছ বুঝই ন পারি।"

একটা অনির্দ্দিষ্ট দোলাচল দ্বন্দ্বের খেলা চলিতে লাগিল মনের মধ্যে তাঁহার—

"অবিরত ধস ধস করয়ে পরাণ।"

গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ দেখিলেন একদিন রাইকে কালিন্দীর কূলে। সে কি রূপ!

"পেখলঁ জনু থির বিজুরিক মালা।"

সেই হইতে তিনি আত্মহারা হইলেন।

"তব ধরি হাম না জানি দিনরাতি।"

তাঁহার নিদ্রা বিগত হইল।

"মনসিজ ধুমে ঘুম নাহি দিঠি।"

রাইও শ্যামকে দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইলেন।

"আকুল করিল প্রাণ।"

তিনি বলেন,—

"কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই ছলিয়া নাগর কান।
ঘরমু যাইতে নারিনু মুই আকুল করিল প্রাণ॥"

তাঁহার

"রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে আপন পরসঙ্গ॥"

কিশোরীর শ্যামের নাম শুনিলেই—"পরাণ উছলে।"

"শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহু কানুর বচন কানে সে মুরলী বাজে॥"

তাঁহার দশা এমন হইল যে শ্রবণ নয়ন এবং নয়ন যেন শ্রবণ সমান হইয়া গেল।

শুনইতে অনুক্ষণ যছু নব গুণগণ শ্রবণ নয়ন ভৈ গেল।
দরশন তাকর এ হেন লোর ঝর নয়ন শ্রবণ সম ভেল॥"

জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ যেদিন প্রথম দর্শন করিলেন রাইকে, তখন তিনি স্নান সমাপন করিয়া চলিয়াছেন।—

"সরস সিনান সমাপরি।"

কৃষ্ণের হৃদয় তাঁহাকে দেখিবামাত্র অনুরাগে পরিপূর্ণ হইল।

"প্রেমে পরিপূরল।"

আর রাই তাঁহাকে চক্ষে দেখার পূর্ব্বেই স্বপ্নে দেখিয়াই অনুরাগে বিভোর হইয়াছিলেন।

"মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই।"

এখন দেখিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি বলেন,—

"চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥"

তাঁহার অন্তর, দেহ, নয়ন, শ্যামের—"দরশ পরশ লাগি" আউলাইতে লাগিল।

"সদা চিত উচাটন বঁধুর লাগিয়া। সদাই সোঙরে প্রাণ গর গর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল। আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥"

তিনি বলেন,—

"কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা॥"

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও দেখিলেন রাইকে স্নানের ঘাটে যমুনা কূলে—নীলাম্বরী পরিহিতা, চলমানা। তাঁহার মনে হইল গতিশীল রাই যেন চলিয়াছেন—তাঁহার পরাণকে নিঙাড়িয়া।

"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।"

এ বর্ণনার তুলনা নাই। ইহা চিরদিনের জন্য রসিকজনের অন্তরে গাঁথিয়া থাকিয়া গিয়াছে। রাই একবার তাঁহার পানে হাসিয়া চাহিল।

"হাসির ঠমকে চপলা চমকে নীল শাড়ী শোভে গায়।"

আবার সে হাসি কেমন,—

"হাসিতে খসয়ে সুধারাশি।"

দেখিতে দেখিতে সেই কিশোরী তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

"নবীনা কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল।"

কৃষ্ণ আত্মহারা হইলেন। মুগ্ধ বিহ্বল হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। সেই বিদ্যুন্ময়ী কিশোরী তাঁহাকে দিশাহারা করিল।

"পুড়ায় কেবল নয়ন যুগল চিনিতে নারিনু কে।"

এদিকে রাইয়ের অন্তরে অনুরাগের স্পর্শ, শ্যামনাম শুনিয়াই লাগিয়াছে। আকুলভাবে তিনি বলেন,—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

শ্যাম—এই দুই অক্ষরের নামটুকু কাণে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার অন্তরে যেন কত জন্ম জন্মান্তরের পরিচিতির স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিল। তিনি শ্যামসুন্দরকে না দেখিয়া না জানিয়া শুধু নাম শুনিয়াই পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

"কেমনে পাইব সই তারে।"

তারপর যেদিন রাই তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিলেন,—সেকি রূপ মুগ্ধতা! সেকি রসবিহ্বলতা!

"সই কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে।।
মল্লিকা চম্পক দামে চূড়ায় টালনি বামে তাহে শোভে ময়ুরের পাখ।
আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখ।।
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্ব হেলন গা দোলে গলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয় রসের নাগর বড় কালা।।"

এই দৃশ্যটি চিরকালের জন্য রাধার অন্তরে গ্রথিত হইয়া গেল। সাথে সাথে বাংলার ঘরে ঘরে, পটে, চিত্রে, শিল্পে, ভাস্কর্য্যে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া রহিল। যুগ যুগান্তর ধরিয়া রহিবে। কারণ ইহা রসিক বাঙ্গালী হৃদয়ের যুগ যুগ প্রেম সাধনার রসমূর্ত্তি ছবি। বাঙ্গালীর বাঞ্ছিত জীবনদেবতার রসঘনরূপ।

রাই বলেন,—

"জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর লোল পিতে করে উতরোল নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।।"
"দুইটি মোহন নয়নের বাণ দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচয়ে ধরমে পরাণ সহিত টানে।"

ইহার পর হইতেই চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমে উন্মাদিনী পারা। এই আত্মহারা ভাব তাঁহার জীবন ভরিয়া সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান।

শ্যামের প্রেমে তিনি এমনি তন্ময় যে—

"দিবানিশি দিশিদিশি কালা পড়ে মনে।"

তিনি স্বপনেও পরাণ বঁধুকে দেখেন।

"পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়র পাশে।"

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর বর্ণিত এই রূপের চিত্র, অনুরাগের চিত্র মরভুবনের সীমা ছাড়াইয়া অসীমতায় গিয়া পেঁৗছিয়াছে।

কৃষ্ণ রূপ—যেন আকাশের নীল অসীমতা।
রাধা তনু আভা—যেন সবিতার জ্যোতির্ম্ময়তা।

তাঁহাদের এই রূপ বর্ণনার বহু পদে—প্রাকৃত রূপচিত্রের অতীত একটা ব্যঞ্জনা আছে।

"যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি।।"
"স্বপ্নসম দেখি তারে ছায়ার সমান ফুরে, মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।।"
"পোড়ায় কেবল নয়ন যুগল লখিতে নারিনু কে।"
"দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে।"

এইরূপ বহু পদে দেহের স্থূলাংশ ছাড়াইয়া লাবণ্যদ্যুতিটুকুরই ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই রূপলাবণ্য কোনো শরীরীর দেহে সম্ভব নয়। এই সৌন্দর্য্য অভিভূত করে, দিশাহারা করে, আকুল করে, দহন করে। পাগল করিয়া দেয়।

ইহার সহিত রক্তমাংসের শরীরী প্রণয় যেন সম্ভব নয়। ইহাকে বাহুবন্ধনে আনা যায় না। ইহাতে দেহজ প্রেমের স্থান নাই। এই রূপলাবণ্য, এই সৌন্দর্য্য মাধুরী দিয়া বিশ্ব দেবতার পূজা করা চলে, মরজীবের ভোগে নিয়োগ করা যায় না।

সাধারণ মানব এই রূপকে চক্ষে ধারণ করিতে পারে না। এ রূপ ইন্দ্রিয়াতীত।

"হের সখি নব জলধর কায়
ধরাতে ধরে না রূপ—নয়নে কি ধরা যায়।"

ইহা নয়নে ধরিবার নয়। ইহা সেই ব্রহ্মরূপ জ্যোতি,—যাহা নরচক্ষুকে ঝলসিয়া দেয়। শুধু যোগী, সিদ্ধপুরুষ, সাধক—যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব ভেদ করিয়াছেন, তিনিই এই অসীম রূপকে, এই রূপজ্যোতিকে কতকটা অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারেন।

ইঁহাদের বর্ণিত অনুরাগচিত্রও বহুস্থলে প্রাকৃত প্রণয় ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে অপ্রাকৃত প্রেমলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

যে রূপকে দেখিয়া রাই মুগ্ধ, আত্মহারা, উন্মাদিনী—সে রূপ শুধু শ্যামদেহকে আশ্রয় করিয়াই থাকে নাই।—তাহা গগনে, ভুবনে, তরুলতিকায়, জলে, স্থলে, বিশ্বচরাচরকে জুড়িয়া রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই শ্যামকে দেখিতে পান।

"পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।"

এই রূপানুরাগ প্রাকৃত অনুরাগ, প্রাকৃত প্রেমার্ত্তি নয়। ইহা রাইকে ভোগিনীর পরিবর্ত্তে যোগিনী করিয়াছে।

রূপজ অনুরাগের মোহ ইহাতে নাই। ভোগিনীর পরিবর্ত্তে মহাবৈরাগিনী করাই ইহার ধর্ম্ম।

পরমহংসদেব বলেন—রাধার যে কৃষ্ণপ্রেম সুখ তা ব্রহ্মানন্দ, তাতো দেহজ-কামের সুখ নয়, সে সুখ বলবার নয়, এ সুখে শত মৈথুনের সুখও তুচ্ছ বোধ হয়। কৃষ্ণ স্মরণে রাধার যে সুখ হোতো, তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শরীরে নানা ভাবের বিকার দেখা যেতো, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার তার নাম, শোনোনি? আসলে সুখ হোল অন্তরে, হৃদয়ের প্রাণকেন্দ্রে।

আত্মবিস্মরণী এই অনুরাগের গাঢ়তা, আকুলতা ও বিহ্বলতা যে কি গভীর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহা অনির্ব্বচনীয়।
রাই বলেন—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি যে করে প্রাণ॥"

এই "কি যে করে প্রাণ", ইহা বচনাতীত।

রাই বলেন,—"সে কথা কহিবার নয়।" এ অনুরাগের কথা কহিয়া প্রকাশ করা যায় না, কাহাকেও বোঝানো যায় না।

তিনি বলেন,—

"সখীর সহিতে জলেরে যাইতে সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল তাহে কি পরাণ রয়।"

যমুনার জলে এই যে ঝলমল অনন্ত রূপরাশি ইহা রাইয়ের চক্ষু ঝলসিয়া দিল, পরাণ দগ্ধ করিল, হৃদয়ে অনুরাগের হোমাগ্নি জ্বালাইল। সে যে কি জ্বালা এই অনুরাগের আকর্ষণের।—সে যে কি গূঢ় গভীর, তাহার বড়জোর একটা বাচ্যাতিশায়িনী ইঙ্গিত কি আভাস দেওয়া যায়। তাহার বেশী এই দুর্ণিবার অনুরাগের কথা ব্যক্ত করা যায় না।

ইহা অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে হয়। তাও যিনি মহাপ্রেমিক, সাধক ভাগ্যবান শুধু তিনিই পারেন। কোনো কোনো মহাভাগ্যবান ইহা অনুভব করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। শুধু তাঁহারাই এই অনুরাগের দুর্নিবার আকর্ষণের যে কি জ্বালা, কি যাতনা, তাহা অনুভব করিয়াছেন, আর তাহা অনুভব করিয়াছেন রাইয়ের মত। অপর কেহ নয়। এই অনুরাগ এমনি যে রাই কামনা করেন মরণকে, তাহা হইলে পঞ্চভূতে মিশিয়া থাকিয়া তিনি শ্যামের স্পর্শ পাইবেন। সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র।

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।।
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ। মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ।।
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ।।
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত।।
যাহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম।।

এই অনুরাগ বুঝাইবার লৌকিক কোনো ভাষা নাই। বৈষ্ণব কবিগণ এই অনুরাগের, এই মহাপ্রেমের চিত্র ফুটাইতে কত না ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। আভাসে, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তবু ইহা অনির্ব্বচনীয়। বলরামদাস একস্থলে এই অনুরাগের গভীরতা বঝাইতে যে ব্যাকুলতার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেও যেন ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই।

বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কল্পকাল যদি নিরবধি দেখি।।
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিয়া তোমারে দেখি স্বপন সমান।।
দেখিতে দেখিতে আঁখি কান্দে দেখিবারে।
পরশিতে চায় অঙ্গ পরশিতে নারে।।
: : : : :
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহ পরতীত।
হারাও হারাও হেন সদা করে চিত।।
হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পঁহুঁ চিত নয় থির।।

প্রকৃত প্রেম, অনুরাগের সহিত, এই মহা অনুরাগ, মহাপ্রেমের এইখানেই প্রভেদ। ভাষার বর্ণনায়, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়—একটা আভাস মাত্র দেওয়া যায়।

ভাষা, উপমা, বর্ণনা, প্রকাশকৌশল, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা—কিছুই এই অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ, প্রেমের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না।

অসীমের মাঝে আপনাকে বিলোপ করার, আপনাকে সম্মিলিত করার যে সীমার ব্যাকুলতা চিরন্তন yearning তাহাই এই অনুরাগে প্রকাশ করা হইয়াছে। "সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা",—এই আবেগ, এই অনুরাগ এতই গাঢ়, গূঢ় ও সুতীব্র যে ভাষা তাহার অনির্ব্বচনীয়তাকে শুধু সঙ্কেত, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার দ্বারা কতকটা আভাস দিয়াছে মাত্র।

শ্রীরাধার এই অনুরাগ--আক্ষেপে পূর্ণ। তাঁহার অনুরাগ অসীম, কিন্তু কানুর সহিত মিলন সীমাবদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, পদে পদে শঙ্কিত, জড়িত। তাই তাঁর আক্ষেপের সীমা নাই। এ আক্ষেপানুরাগ মনে হয় যেন শ্যামের মহা-প্রেমের একটা কূলকিনারা না পাইয়া রাইয়ের অন্তরের আকুলি ব্যাকুলি। রাধার এই মনের অস্বস্তি, এই আক্ষেপের সুর প্রত্যেক সাধকেরই প্রাণের আক্ষেপের আর্ত্তবাণী।

বর্ষা ও অভিসার

বৈষ্ণব কাব্যে প্রকৃতি ও মানবমনে একটা রহস্যবোধের রোমাণ্টিক চেতনা পরিস্ফুট তীক্ষ্ণ ও গভীরভাবে, বিচিত্ররূপে। প্রকৃতি ও মানব অন্তরকে একই বৃন্তে বিধৃত করিয়া তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন এক বিচিত্র জগৎ।

বৈষ্ণব কবিকুলের প্রকৃতিচিত্রের বিশেষত্ব এই যে,—মুখ্যভাবে না হউক গৌণভাবে, তাহা মানব হৃদয়ের সহিত প্রকৃতির একটা অখণ্ড, গূঢ়, গভীর ও চিরন্তন সংযোগের আভাস দিয়াছে।

প্রকৃতি তাঁহাদের শ্রীরাধার মানস-ভাব-তরঙ্গের সাথে সাথে তরঙ্গায়িত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাইয়ের উল্লাসে উল্লসিত, বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া তাঁহার সহিত সহমর্ম্মিতা করিয়াছে।

প্রকৃতির এই উল্লাস দেখিতে পাই বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলনের গানগুলিতে। প্রকৃতি যেন রাইয়ের উল্লাসে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন তাহারও ভাব-সম্মিলন। রাইয়ের জীবনে আজ নববসন্ত জাগিয়াছে। প্রকৃতির জীবনেও যেন নববসন্ত সঞ্চার হইয়াছে।

"দখিণ পবন ঘন অঙ্গ উগারএ কিসলয় কুসুম পরাগে।"

রাই আজ আপন আনন্দে আপনি পরিপূর।

"আজু মঝু গরমভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সে পরিপূর॥"

প্রকৃতিও আপন রসে আপনি মাতোয়ারা।

"মলয় পবন ডোলয় বহুভাতি।
অপনে কুসুম রসে আপনি মাতি॥"

শ্রীরাধিকার সাথে সাথে সেও আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া উঠিয়াছে। রাধাশ্যামের প্রণয় মিলনোৎসবের দিনে বিশ্ব চরাচরও যেন প্রণয়ে মগ্ন হইয়াছে।

"প্রণয় পয়োধি জলে এল ঝাঁপল, ঈ নহি যুগ অবসানে।"

আজি স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, প্রকৃতি এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। —প্রকৃতির কুঞ্জ জ্যোৎস্নাধবল। মধুকর রমণী মঙ্গল গাহিতেছে। দ্বিজবর কোকিল মন্ত্র পড়ায়। মকরন্দ আচমনের জল যোগায়। সোনালি কিংশুক তোরণ

সাজাইতেছে। বেল ফুল লাজাঞ্জলি ছড়াইতেছে। কেশু কুসুম সিন্দূর দান করে। শ্বেতকমল বরণডালা হাতে দাঁড়াইয়া।

"দ্বিজবর কোকিল মন্ত্র পড়াব। মধুকর রমণী মঙ্গল গাব।।
করু মকরন্দ হথোদক নীর। বিধু বরিয়াতী ধীর সমীর।।

সারা প্রকৃতি যেন প্রেমের মহামহোৎসবে লাগিয়া গিয়াছে। আজ সকলি মধুর।

"মধুঋতু মধুকর পাঁতি। মধুর কুসুম মধুমাতি।।
মধুর বৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ।।"

আজি রাধার কৃষ্ণ মিলনোৎসব,—এ যেন প্রকৃতিরও বসন্ত-মিলনোৎসব। এইত গেল উল্লাসের কথা।

অন্যত্র আবার রাইয়ের বিরহ বেদনায় দেখি প্রকৃতি ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন তাঁহারই বিরহ। রাইয়ের সহিত সহমর্ম্মিতা দেখাইতে গিয়া প্রকতির দুই চোখে—"সঘনে ঝরয়ে জল।" রাইয়ের সাথে তাহার জীবনেও যেন "মাথুর" আসিয়াছে। শ্যামহারা বৃন্দাবনের তরুলতা, পুষ্প পল্লব, বন, উপবন, আকাশ, বাতাস রাইয়ের মতই শোকাচ্ছন্ন। প্রকৃতির এই সহমর্ম্মিতা বৈষ্ণব কবির মাথুরের গানগুলিতে দৃষ্ট হয়।

"কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল, কোকিল শোকিল, বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দমন্দ ভেল, চন্দন কন্দন, মারুত মারত ধাব।।"
"কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে, সঘনে রোয়ত শুকসারী।।" গোবিন্দদাস
"সারী শুক পিক কপোত না ফুকরত, কোকিল না পঞ্চমগান।
কুসুম তেজি অলি ভূমিতলে লুঠই, তরুগণ মলিন সমান।" গোবিন্দদাস
"রোদতি পিঞ্জর শুকে। ধেনু ধাবই মাথুর মুখে।।" বিদ্যাপতি
"তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণীপর স্থল, জল কমল হতাশ।।" পুরুষোত্তম

পশুপক্ষী, যমুনার নীল জলধারা, বনপথপ্রান্তর, কুসুম, তরু, লতিকা, সকলই যেন রাইয়ের দুঃখে দুঃখিত, ম্লান। একটা কারুণ্য, একটা বিষাদের ছায়া সর্ব্বত্র।

রাইয়ের এই বিরহ বেদনায় সহমর্ম্মিতা দেখাইয়া প্রকৃতি মাসে মাসে তাঁহার নব নব হৃদয় ব্যথার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কেমনভাবে চলিয়াছে তাহাও বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর "বারমাস্যার" পদগুলিতে অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে কিরূপে রাইয়ের অন্তরের বিরহ-বেদনার বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, রাইয়ের হৃদয় মনের সহিত সহযোগিতা

করিয়াছে, রাইয়ের হৃদয় ব্যথার উদ্দীপন বিভাবের কার্য্য করিয়াছে, কেমন করিয়া রাইয়ের জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, এই পদগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

গোবিন্দদাসের—

"আমন মাস রাস রস সায়র নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিণীগণ পুরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল।।
.. ..

বিদ্যাপতির—

"মুকুল পুলকিত বল্লি তরু অরু চারু চৌদিক সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনি বিরহে তাপিনি সকল সুখ পরিবঞ্চিতা।।
.. ..

জ্ঞানদাসের—

"গগন ভরল নব বারিধরে বরখা নব নব ভেল।
বাদর দরদর ডাকে ডাহুকী সব শবদে পরাণ হরি লেল।।
.. ..

ঘনশ্যামের—

"অব, ভেল শাঙন মাস। অব, নাহি জীবনক আশ।।
ঘন, গগনে গরজে গভীর। হিয়া, হোত যেন চৌচির।।
.. ..

প্রভৃতি পদগুলিতে প্রকৃতির সহিত রাইয়ের তথা মানব হৃদয়ের গভীর সংযোগের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋতুর পর ঋতু চলিয়া যায়। রাইয়ের নৈরাশ্য বাড়িয়া যায়। এই নৈরাশ্যের কারুণ্য ধারা এইসব পদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।

বৈষ্ণব কাব্যের প্রকৃতি চিত্রে আরও দেখি সে নিঃশেষে নিজ সৌন্দর্য্যসুষমা উজাড় করিয়া দিয়া রাইকে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে কেমন করিয়া তিলোত্তমা গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতি যেন নিজেই এই তিলোত্তমাকে গড়িতে তাহার পরিবেশমণ্ডলীতে পরিণত হইয়া একদা তাহাকে নিখিল সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করিয়াছে। সে কি রূপলাবণ্য! যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া চিরসুন্দর কিশোর শ্যাম আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

এই প্রকৃতি কত রূপে, ছন্দে, গানে, ভঙ্গীমায়, বৈচিত্র্যে রাইয়ের সহচরীর, নর্ম্ম সখীর খেলা খেলিয়াছে। অনুকূল পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া কখন রাধার নয়নে নিদ্রাবেশ ঘটাইয়া সুমধুর সুখস্বপ্ন আনিয়া দিয়াছে।—

—বরিষণের রিমিঝিমি, ঝিল্লির একটানা সুর, দাদুরী ডাহুকীর কলস্বর, কোকিলের কুহুতান,—সকলি দিয়া শ্রীমতীর ঘুমটিকে ঘনাইয়া তুলিয়াছে।

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে।।
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল কোকিল কুহরে কুতহলে।
ঝিঁঝিঁ ঝিনিঝিনি বাজে ডাহুকী সে গরজে স্বপন দেখিনু হেন কালে।।"

জ্ঞানদাস

তারপর রাইয়ের সেই স্বপ্নদৃষ্ট লীলামাধুরীটুকু। প্রকৃতি বিরচিত অনুকূল আবেষ্টনীর মাঝে কি অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে!

"কিবা সে ভুরুরভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে।।
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ মান ভয় গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।।" জ্ঞানদাস

প্রকৃতি রাইয়ের অভিসার যাত্রায় নির্জ্জনতা ও অন্ধকারের কুহেলি রচনা করিয়া সহায়তা করিয়াছে, কখন বা অভিসারপথে বিঘ্ন ঘটাইয়া রাধার প্রেমের দুর্নিবারতা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছে!

যে মোহনিয়া রূপে শ্রীরাধা মুগ্ধ, সেই নবঘনশ্যাম রূপের মহিমা দিকে দিকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া রাইকে পুলকবিহ্বল করিয়াছে। আকাশের নীলিমা নব নীরদমালা, বনের কদম্ব, পিয়াল, তমালশ্রী, যমুনার নীল জলরাশি, ময়ূর ময়ূরীর বর্ণ চিক্কণতা,—। সে সবের পানে চাহিয়া চাহিয়া রাই পুলক-আকুল হইয়া বলিয়াছেন—

"পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।" চণ্ডীদাস

প্রকৃতির সহিত রাধা হৃদয়ের তথা মানব অন্তরের এই যে সংযোগ, এই যে সহমর্ম্মিতা, তাহা বৈষ্ণব কবিকূলের বর্ষাচিত্রে অধিকতর পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

আকাশ ও পৃথিবীর এই মিলনোৎসবের দিনে মানব হিয়াও কি জানি কেন মিলনের জন্য আকুল হইয়া উঠে। মানব হৃদয়ের এই নিগূঢ় সত্য তাঁহাদের বর্ষাচিত্রে সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

বর্ষার দিনে যখন ঝঞ্ঝা ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া ফিরে, ভুবন ভরিয়া বারিবর্ষণ হয়, শত শত বজ্রনিপাত হইতে থাকে, নীপনিকুঞ্জে ময়ূর ময়ূরী প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করে, চতুর্দ্দিকে মত্ত, দুর্দ্দুর, ডাহুক ডাহুকী ডাক দেয়, আকাশ নিবিড় ঘন কৃষ্ণ মেঘে মসীবর্ণ, তখন মানব হিয়ার অন্তঃস্থলে রহিয়া রহিয়া যে গভীর বিরহ ব্যথা, কি যেন নাই, কিসের যেন একটা অভাব, অজ্ঞাত বেদনা, একটা অনির্দ্দিষ্ট অতৃপ্তি, কাহার অনুপস্থিতিজনিত মর্ম্মপীড়া, কোন্ পরমপ্রিয়ের জন্য আকুলতা, ক্ষণে ক্ষণে মনের গহীনে হাহাকার জাগাইয়া তোলে,—তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের বর্ষার গানে।

ইহাকেই রূপ দিতে গিয়া বোধ করি কবি বিদ্যাপতি রাইয়ের মুখ দিয়া বলিয়াছেন,—

"ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

বাঞ্ছিতের অভাবজনিত হৃদয়ের হাহাকারের মূর্ত্ত ছবি। এখানে রাইয়ের অন্তরের সহিত সহমর্ম্মিতা দেখাইতে গিয়া প্রকৃতিও যেন আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া, বর্ষিয়া, গর্জ্জিয়া উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

"ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবনভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া॥
কুশিল শতশত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোয়াওবু হরি বিনু দিন রাতিয়া।" বিদ্যাপতি

এদিনে মানবাত্মাও এমনিভাবে কহে,—

"কৈসে গোয়াওবু হরি বিনু দিনরাতিয়া।"

মনের মাঝে যে উদাস গভীর আকুলতা জাগিলে মানবাত্মা যুগে যুগে, দেশে দেশে বলে—পরমকাম্য, পরম আত্মীয়কে না পাওয়া অবধি কি করিয়া এই জীবন ধারণ করি—তাঁহাদের বর্ণিত বর্ষার গান তাহারই আভাস জাগাইয়া তোলে। রাধাহৃদয়ের অশান্ত হাহাকার, বর্ষাপ্রকৃতির এই আর্ত্তনাদের সহিত মিলিয়া যেন এক অখণ্ড বিশ্বব্যাপী বিরহব্যথার চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধরিয়াছে।

এই বর্ষার দিনে প্রিয়তমের বংশীধ্বনির আহ্বান দুর্নিবার হইয়া উঠে। গৃহে আছে গুরুজনের গর্জ্জন, স্বামীর তর্জ্জন, ননদীর বাক্যজালা, বাহিরে মুরলীধ্বনির তীব্র আকর্ষণ। এই যে রাধাহৃদয়ের দোটানার দ্বন্দ্ব—ইহাতে বংশী ধ্বনিরই জয় হইল। কুলশীল সমাজ সংস্কার তুচ্ছ হইয়া গেল। নদীধারার দুর্গম পথে উদ্দামবেগে সিন্ধুপানে অভিযাত্রার ন্যায় রাই পরম কাম্যের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করিলেন।—এমনি করিয়াই যুগে যুগে কত জনাই না এই বংশীর আহ্বানে দেশে দেশে সকল ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন। এই বংশীধ্বনির নিদারুণ দংশনের জ্বালায় গৃহে থাকিতে পারেন নাই।

"মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং।" জয়দেব

রাই চলিলেন এই দিনে। অভিসার রচনার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। শ্যাম-সরোবরে ঝাঁপ দিবার ইহাই সুদিন।

চলার বিরাম নাই রাইয়ের। ছুটিয়া আসে মালতী কেয়া কূটজের গন্ধ পথিমধ্যে, বাধা দিয়া রাইকে বলে—আর যেওনা। আকাশের বিদ্যুৎ বলে—যেওনা রাই। তমাল পিয়াল কদম্ব ডাল দুলিয়া বলে—এদুর্যোগে যেওনা শ্রীমতী। লবঙ্গলতিকা অঙ্গ হেলাইয়া বলে—অনুরোধ করি হে রাই যেওনা আর, এদুর্যোগে প্রাণে বাঁচিবে না।

কল্লোল স্ফীতা গিরিনদী ঝঙ্কার তুলিয়া বলে--যেওনা, যেওনা। ময়ূরের কেকা কহে--যেওনা। গুহায় গুহায় সংহত ঝমঝম, তৃণগুল্মে রিমিঝিমি--বাধা দিয়া রাইকে বলে--যেওনা। তবুও নিখিল বর্ষা প্রকৃতির নির্ম্মম বেষ্টনী নিগড়িত করিতে পারিল না রাইয়ের দুর্দ্দমনীয় অভিসার। রাই চলিয়াছেন। তাঁহার এই অভিসার লীলা আজিও চলিয়াছে, কালিও চলিবে, নিত্যকালের এই যাত্রা।

গোবিন্দদাসের রাই যখন হরি অভিসারে যাত্রা করিলেন তখন প্রকৃতির বাহিরে কি দুরন্ত হাহাকার!—

"গগনহি নিমগণ দিনমণি কাঁতি। লখয়ি না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার। গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
চৌদিকে অথির পবন তরুদোল। জগভরি শীকর নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরী নগর পুরবাট। মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥" গোবিন্দদাস

এমনি এক দারুণ রাতে বিদ্যাপতির রাইও দিলেন "ঘোরতিমিরহি ঝাঁপ।"

"পহুপিছর নিশি কাজর কাঁতি।
পাঁতরে ভৈগেল দিগ-ভঁরাতি॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝনঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান॥" বিদ্যাপতি

যখন জ্ঞানদাসের রাই চলিলেন অভিসারে, নব অনুরাগভরে, রজনী অতিগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দশদিশি ছাইয়া দামিনী ঝলক হানিতেছে।

"মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশদিশ আপি।
নীল বসনে সব তনু ঝাঁপি॥" জ্ঞানদাস

প্রকৃতির এদিনে চণ্ডীদাসের পরমভাগবদময়ী রাইও উতলা হইয়া উঠিয়াছেন।

"ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে।
সেই হতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥" চণ্ডীদাস

তবে তাঁহার রাই অভিসারে বাহির হন নাই। বৈষ্ণব কবিবৃন্দের যে নীল শাড়ী প্রেমের বিজয়কেতু তাহাও তাঁহার রাইয়ের পরিধানে নাই। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে রাঙ্গাবাস এক নৈসর্গিক প্রেমের আত্তি তাঁহাকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়াছে। আহার নিদ্রাবিরতা, যোগিনীর ন্যায় ধ্যাননিমগ্না, দৃষ্টি তাঁহার মেঘের পানে স্থির নিবদ্ধা।

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে যেমন যোগিনী পারা।" চণ্ডীদাস

গোবিন্দদাসের রাই এত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়া দেখিলেন প্রিয় নাই। বিলাপ করিয়া বলেন,—

"যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান।" গোবিন্দদাস

জ্ঞানদাসের রাইয়েরও প্রিয় দরশন মিলিল না।

"সই কি কব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইনু নব অনুরাগভরে।।
এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব বঁধুয়া দরশন বিনে।
বিফল হইল মোর মনোরথ প্রাণ করে উচাটনে।।" জ্ঞানদাস

বিদ্যাপতির রাইও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"এত করি আইলিহুঁ জীব উপেখি।
এই সোও না ভেল মোহে মাধব দেখি।।" বিদ্যাপতি

ক্ষণের পর ক্ষণ বহিয়া যায়। প্রিয়তমের দেখা নাই। প্রতীক্ষার বেদনাবহ্নি হৃদয়দহন করিতে থাকে।--শেলসম যৌবনকে অঙ্গে অঙ্গে ধারণ করিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকা। কত কথাই মনে পড়ে আজ রাইয়ের। কবে নিদাঘ রজনীতে প্রিয়তমের বক্ষে তাপিত অঙ্গ জুড়াইয়াছে, কোন্ এক বরষার দিনে অশনি গর্জ্জনে ভীত চকিত হইয়া পরাণ বঁধুয়াকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে, একদা শীতের রাত্রে দয়িতের অঙ্কে শৈত্য নিবারণ করিয়াছে! শরতে, হেমন্তে, বসন্তে চিরসুন্দর শ্যামনটবরের সহিত কত না রস-মহোৎসবে প্রমত্ত হইয়াছে! কবে বিমল জ্যোছনাভরা রাতে কুসুম শয্যাপরে শ্যামের বক্ষে বিপুল সোহাগে যাপন করিয়াছে!

কিন্তু আজ এ হেন রজনীতে প্রিয় নাই কাছে।

"কানু রহল পরদেশ।"
"নিকরুণ কান্ত না আব।" জ্ঞানদাস

কত ক্রন্দন, কত আর্ত্তি, প্রপত্তি, বিষণ্ণ শূন্যতা, উৎকণ্ঠিতপ্রতিক্ষা, এই সব পদে লুক্কায়িত আছে। বর্ষার এদিনে মানব হিয়াও এমনি করিয়া উচাটন হইয়া উঠে। প্রবাসী প্রিয় বঁধুয়ার জন্য মন এমনি করিয়াই মথিত হইতে থাকে। এমনি করিয়া প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া তাহারও না জানি কত কথাই মনে পড়ে। সেও হয়ত রাইয়ের মতই বলিতে থাকে—আজি বর্ষার নববারি ধরে গগন ভরিয়া উঠিল। ডাহুকীর নিনাদ, শিখণ্ডিনীর কেকা-ধ্বনি, চাতকীর কাতর বিলাপ প্রাণকে উতলা করিল; উলসিত কুন্দ, কুমুদ, কহ্লার ফুটিয়া মনকে প্রমত্ত করিল, এখন আমি কি করিয়া প্রিয় বিরহ সহ্য করিতে পারি?

—"বরখা কেমনে গোঙাব?" জ্ঞানদাস
"দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি পরাণ মাঝারে হানে।"
"ধারা সঘন বরষ ধরণীতল বিজুরী দশদিশ বিন্ধই।
ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনী বিরহিনী কৈসে জীবই॥" বিদ্যাপতি

রাইয়ের মত সেও বলে—এমন দিনে প্রিয়হারা আমার যৌবন বনদাবের মত হইল।—

"যৌবন হোল আজি বন-বিরহ-হুতাশন।"
"সজনি আজি শমন দিন হোই।
নবনব জলধর চৌদিক ঝাঁপেল।
হেরি জীউ নিকসয় মোয়॥" বিদ্যাপতি

রাইয়ের এইরূপ শোকোচ্ছাসের পর শোকোচ্ছাস, এই ক্রন্দনরোল যেন সমগ্র বিশ্বের সকল বিরহী হিয়ার সম্মিলিত বিলাপধ্বনি। বৈষ্ণব কবিগণ বিশ্বক্রন্দসীকে যেন শ্রীরাধায় রূপায়িত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কাব্যে অভিসারের পথ অত্যন্ত দুর্গম, দুরারোহ ও বিঘ্নসঙ্কুল করা হইয়াছে। নানাবিধ হতাশা ও নিষ্ফলতার সৃষ্টি করা হইয়াছে। মিলনের পূর্ব্বে দীর্ঘ প্রতীক্ষার বেদনা জাগাইয়া রাখা হইয়াছে। এইগুলিতে একটা অসাধারণতার অনুক্রম রহিয়াছে, একটা লোকাতীত ব্যঞ্জনা আছে। এই সবের দ্বারা বৈষ্ণব কবিগণ হয়ত বুঝাইতে চাহিয়াছেন—কষ্টের কষ্টিপাথরে যাচাই না হইলে কি ইষ্ট মিলে? ইষ্টকে পাইতে হইলে অনেক ক্লেশ, অনেক দুঃখ, অনেক দহন সহ্য করিতে হয়। ইহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই। ধ্রুবকে পাইতে হয় সর্ব্বস্বের মূল্যে। প্রেমকে প্রস্ফুটিত করিতে হইলে অশেষ দুঃখের সাধনার প্রয়োজন। দুঃখের পাষাণে না ঘসিলে কি পিরিতির সুরভি বাহির হয়? দুঃখ বেদনার তপস্যায় হৃদয়ের শাখে শাখে পিরীতির স্বর্গীয় ভাব-কুসুম অরূপ-লাবণ্যে মনোকুঞ্জে ফুটিয়া উঠে। অন্তর বসন্তের অরূপ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া যায়। আর সেই সকল সৌন্দর্য্যের সার, জীবনের জীবন প্রিয়তমের রাসমঞ্চ তখনই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে নয়।

ঘন মেঘের দুর্য্যোগময়ী দিবসে অভিসার রচনা করিয়া বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী এই বাণী ফুটাইতে যতটা সমর্থ হইয়াছেন, এমনটি অপর কোনো অভিসারে হয় নাই। তাঁহারা হিমাভিসার, বসন্তাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভিসার, দিবাভিসার, কুঝটিকাভিসার,—এইরূপ অভিসারের বৈচিত্র্য কতই আঁকিয়াছেন, সকলগুলিই রসমধুর হইয়াছে, কিন্তু বর্ষাভিসারের ন্যায় সেগুলি সকরুণ, মর্ম্ম-স্পর্শী হইয়া উঠে নাই। বর্ষার ক্রন্দসীমূর্ত্তি যেন শ্রীরাধার অন্তরের বহিঃপ্রকাশরূপেই

এখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষাভিসারের পদগুলি এই অনুকূল পরিবেষ্টনীতে নিবিড়, গাঢ় ও করুণতম হইয়া লোকোত্তরতা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবি, সাধক ও রসজ্ঞগণ এই অভিসার সম্বন্ধে বলেন—"যো বৈ ভমা তৎসুখং নাল্পে সুখং অস্তি"। —অল্পে সুখ নাই। যাহা অনিত্য, অস্থায়ী তাহাই অল্প। যাহা নিত্য, যাহা চিরন্তন তাহাই ভূমা। এই নিত্যের প্রতি প্রেম জন্মিলে অনিত্যের সকল বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। তখন সে অভিসারিকার মতই ধাবিত হয়। সে পথ ক্ষুরধারের ন্যায়—"নিশিত দুরত্যয়"।

তাঁহাদের মতে অভিসার বিনা জীবন রসময় হয় না। তাই বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের রাইকে--পরকীয়া প্রেমের চিরন্তন অভিসারিকারূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

পাতিব্রত্যে নাই পরকীয়ার মাধুরী।

--পতিভাবের প্রেম বাধাবিপত্তিহীন, তাহা নদীর সিন্ধুপানে যাত্রা করার মত বেগবতী নহে। উপপতিভাবের প্রেম লোক, লজ্জা, ভয়, নিন্দা, বেদ, বিধি, ধর্ম্ম ও ভেদের জগতের সকল সংস্কার ত্যাগে মহা অনুরাগময়ী। উপপতিভাব নিরপেক্ষ, বাহ্যশূন্য, গাঢ়, তীব্র ও আমিত্ববর্জ্জিত। তবে এ পরকীয়া ধর্ম্ম ভেদের জগতের জন্য নহে। তাঁহারা রাধাশ্যামের লীলা যে বৃন্দাবনে ঘটাইয়াছেন তাহা ভেদের জগতের বাহিরে।—সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময়ী স্বপ্নলোক এই বৃন্দাবন। এখানে নিখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—ভগবানের, মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার সহিত রসময় লীলাবিলাস ঘটাইয়া তাঁহারা এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন—অশ্রুবিনা জীবন প্রেমানন্দে মাতে না।

তাই বর্ষার ভরা কান্নার দিনে বৈষ্ণব কবিকুল রাইয়ের চোখে প্রেমের অশ্রু বহাইয়া জগত ভাসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অঙ্কিত বর্ষা—সেও যেন বিশ্বপ্রকৃতির বিরহিনী রাধামূর্ত্তি। সেও যেন রাইয়ের মতই মানবহৃদয়ের সমুদয় আকুলতা, তন্ময়তা, ও বেদনার রূপকে নিজ অঙ্গে আঁকিয়া ধরিয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতির এই বর্ষা, বৈষ্ণব কাব্যের বিরহিনী রাই ও মানবাত্মার অজানার জন্য ব্যাকুলতা—অনন্তের জন্য সান্তের চিরন্তন রসাবেগ eternal yearning যেন একই বস্তু। একই অখণ্ড লীলারহস্যের বিভিন্ন রূপ।

রবীন্দ্রনাথ অভিসারকে অবলম্বন করিয়া একটি কবিতায় বলিয়াছেন,—

"তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে নিত্যপুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোকে।
নিত্যই সে একা, সেই ত একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়। আনন্দে যে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
সেওত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ।
সে যে বাজায় বাঁশি।--প্রতীক্ষার বাঁশি,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা—
পদে পদে মিলেছে একতানে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।" রবীন্দ্রনাথ

দেশে দেশে যুগে যুগে রাই--নদী চলিয়াছে এই যাত্রার ছন্দে,—চিরন্তন অভিসারিকারূপে, শ্যাম-সমুদ্রের পানে। আর শ্যাম-সমুদ্র দুলিতেছে অহর্নিশি এই বংশীর আহ্বানের সুরে।—প্রতীক্ষার বংশীধ্বনি তার আগাইয়া চলে অন্ধকারের পথে। এই চিরন্তন অভিসার লীলা চলিয়াছে নিত্যকাল ধরিয়া,— নিত্য অনিত্যে, অসীম সসীমে, পূর্ণ অপূর্ণে।

বৈষ্ণব কবিবৃন্দের বর্ষা ও বর্ষাভিসারের পদগুলিতে "পরমকাম্যধনের আকর্ষণে ভক্তের অভিযান"—এই বাণী, সার্থকরূপ লাভ করিয়াছে। শ্রীরাধার এই অভিসারই সমগ্র বৈষ্ণবকাব্যের লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড। ইহার দ্বারা প্রেমা-বেগের লৌকিকসীমা অতিক্রম করিয়া ভগবৎপ্রেমে লইয়া যাওয়া হইয়াছে ও ইহাকে লোকোত্তরতা দান করা হইয়াছে।

মান ও আক্ষেপাভিমান

বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণ মানিনীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ।

রাই শ্যামসুন্দরের উপর মান করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি সেই ছবি আঁকিতেছেন,—

"অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
অভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমলবর নয়নী।
নয়ন লোরে বহি যাওত ধরণী॥"

কি অপূর্ব্ব এই চিত্র! পড়িতে পড়িতে মনে স্বতঃই জাগে—সেদিন কি কবির চোখের সামনে ছিল একটি কিশোরী—লাবণ্যে ঢল ঢল? মেয়েটি কি ছিল তখন অভিমানরতা?—প্রেমে উপেক্ষিতা, আত্মসম্মানাহতা, হইয়া বেদনায় বিগলিত নয়না?

কবি কি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া রাইয়ের মানের চিত্র আঁকিলেন? আজ সে কবি নাই, সে কিশোরীও নাই; সে শ্যাম নাই, সে রাইও নাই, আছে সেই মানিনীর চিত্রটি চিরন্তন হইয়া।

ইহার পর বহুদিন গত, একদা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির এই জীবন্ত আলেখ্যে মুগ্ধ হইয়া,—অনুরূপ একটি মানিনীর চিত্র আঁকিলেন।

"মাধব অপরূপ পেখনু রামা।
মানিনী মানে অবনীপর লেখই
নয়নে না হেরি শ্যামা॥"

তারপর একদিন জ্ঞানদাস এই সজীব, সরস চিত্রটিকে করিলেন গতিশীল।

"অনুনয় করতেই অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী॥
অঞ্চলে পরশিতে চঞ্চল কাণ।
রাই কমল পদ আধ পয়ান॥"

যেন ছায়াচিত্রের ছবির মত চলনশীল।

বিদ্যাপতির রাইয়ের মানের চিত্র তুলনা রহিত। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির রাধার দুর্জ্জয় মান যেন উপলাহত প্রবাহের ন্যায় গর্জ্জিয়া, রোষিয়া, শ্বসিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রাইয়ের মুখকমলখানি কখন আরক্তিম, কখন অশ্রুসজল, কখন অগ্নিময়ী, কখন নৈরাশ্যম্লান। তাঁহার তীব্র, জ্বালাময়ী বাক্যবাণ শ্যামের অন্তরভেদ করিয়া যেন আমাদেরও মর্ম্ম বিদ্ধ করে।

রাই বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—

"যাবে রহি অ তুঅ লোচন আগে।
তাবে বুঝাবহ দিঢ় অনুরাগে॥
নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে।
কপট হে মাধব কতিখন বাণে॥"

যতক্ষণ চক্ষুর সম্মুখে ততক্ষণই তোমার অনুরাগ। চক্ষের আড়াল হইলেই সেই ভাবান্তর। হে মাধব, কপটতার মূল্য কতক্ষণ থাকে ?

রাই ব্যঙ্গভরে বলেন,—

"হসি হসি করহ কি সব পরিহার।
মধু বিষে মাখল শর পরহার॥"

হাসিয়া হাসিয়া প্রেম করিয়া কি সকলকেই এমনিভাবে পরিহার কর ? মধু বিষে মাখা শর প্রহার কর ?

তুমি "হৃদয়ে কপট মুখে করহ পিরীতি।" তোমার "বিনয়বচন যত রস পরিহাস"। "মধুসম বচন কুলিশ সম মানস।"

রাই বিলাপ করিয়া বলেন,—

"অমৃত বধি হম লতা লাওল বিষে ফলি ফলি গেল।"
"চন্দন ভরমে শিমর আলিঙ্গন খালি রহল হিয় কাঁটে।"
"চন্দন ভরমে সেবলি হম সজনি পূরত সকল মনকাম।
কন্তক দরশ পরশ ভেল সজনি শিমর ভেল পরিণাম॥"

তিনি বিলাপ করিয়া কহেন, বড় ভুল করিয়াছি, ফলে প্রতারিত হইয়াছি। আর নয়, ইহাই যথেষ্ট। এইরূপে রাই শ্যামের প্রতি বিমুখ হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণ আসিয়া বলেন—করজোড়ে মিনতি করি রাই—ত্যাগ কর মান। দেখ পূর্ব্বাচলে অরুণোদয় হইল।

"অরুণ পূরব দিশা।"
"মুদি গেল কুমুদিনী।"
"গগন মগন ভেল চন্দা"

এ সময়ে কিনা তোমার "মুদল মুখ অরবিন্দা।" এ বড়ই অনুতাপের। হে রাই কমলিনী, চোখ মেলিয়া চাহ। দেখ কমলসকল ফুটিয়া উঠিল। তাহা দেখি ভ্রমর মধুপানে ছুটিল। বিরল-নক্ষত্র আকাশে প্রভাতের ভাতি দেখা যায়। আশায় কোকিলের মনে হাসি ফোটে। হে মানিনি, ফিরিয়া চাও। অরুণ দেখ অন্ধকার পান করিতেছে।

"তনিহি লাগি ফুলল অরবিন্দ।
ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ।।
বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস।
সে শুনি কোকিল মনে উঠ হাস।।
এরে মানিনি পলটি নেহার।
অরুণ পিবয় লাগল অন্ধকার।।"

এত অনুনয় অনুরোধেও রাই রহিলেন তেমনি বিমুখ।

মাধব পুনরায় সাধিলেন,—

"বদন সরোরুহ হাসে লুকও লহ তেঁ আকুল মন মোরা।
উদিতেও চন্দা অমিয় ন মুঞ্চয় কি পিবি জীউত চকোরা।।"

কিন্তু তাঁহার সকল সাধ্যসাধনা বিফল হইল।

"কোপে কমলমুখী পলটি ন হেরল
বৈসলি বিমুখ বিরাগে।"

সখিরা আসিয়া বুঝাইলেন কত—

"ভাল নহে অধিক উদাস।"

ভয় দেখাইলেন তাঁহারা—

"আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গমাওবি রোই একান্ত।।"

সখিরা বলিলেন—

"ভাগে মিলয় ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত।।"
"মানিনি আর উচিত নহি মান।"

ঐ দেখ—

"রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি যে কর অধর মধুপান।"
"মধুর মধুর পিকবর তরু তরু সব করু করু লতিকা সঙ্গ।"

এখন কি রাই মান করিয়া বসিয়া থাকা শোভা পায়?

রাই তবুও অটল।

দিন যায়, রাত্রি আসে।

সখীরা পুনরায় বলেন—

"জুড়ি বয়নী চকমক কর চাঁদনী এহন সময় নহি আন।"

"ভাগে মিলয় ইহ প্রেম সংযাতি।
ভাগে মিলয় ইহ সুখময় রাতি॥"

এমন চাঁদিনী চকমক রজনীতে তুমি কিনা "হরি পরিহরি", অভিমান করিয়া রহিয়াছ, রাই ত্যাগ কর মান। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

রাই তথাপি অবিচলিত। তাঁহার দুরন্ত, দুর্জ্জয় মান শ্বসিয়া শ্বসিয়া হৃদয়কে শ্বসিয়া শ্বসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

"জলথল কুসুম কৈসন হোর মালা।"

রাই বলেন—

"তোড়ি জোড়িয় যাহা গেঁঠে পএ পভতাঁহ, তেজতম পরম বিরোধ।"

পুরুষ হৃদয় ও জল দুইই সমান চঞ্চল।

"পুরুষ হৃদয় জল দুঅও সহজে চল।"

সেই পুরুষের প্রেমে কেহ যেন বিশ্বাস স্থাপনা না করে।

চিত্রের পর চিত্রে রাধিকার বাক্যচ্ছটায় এক দুর্জ্জয় অভিমানিনীর চিত্র এইরূপে রূপায়িত হইয়াছে।

তিনি এতই আহত হইয়াছেন যে, বলেন,—পুনরায় যদি জন্ম হয় কাহারও, সে যেন যুবতী হইয়া না জন্মায়।

"জনম হোয়য়ে জনি জঞো পুনু হোই।
যুবতী ভই জনময় জনু কোই॥"

তারপর কতকাল গেল। কবি দুঃখ করিয়া বলেন—কত অরুণ উদিত হইল। কত চন্দ্র অস্ত গেল। কত ভ্রমর কোলাহলে জাগিল। সুখে ঘুমাইল কত অরবিন্দ। তবু রাইয়ের মান ভাঙ্গিল না। দীর্ঘকাল শ্যামসুন্দর পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

"কতএ অরুণ উদয়াচল উগল। কতএ পছিম গেল চন্দা॥
কতয় ভ্রমর কোলাহলে জাগল। সুখে শুতথু অরবিন্দা॥
কামিনী যামিনী কঁাহা গেলি।
চিরসময় আগত হরিভেল পাহুন, আধও কেলি ন ভেলি॥"

দীর্ঘ সময় গত হইল তথাপি রাইয়ের মান ভঞ্জন হইল না।

গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের রাইয়ের মান বিদ্যাপতির রাইয়ের অনুরূপ। অবনমিত, দুর্জ্জয়।

গোবিন্দদাসের রাই মানে বসিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মানভঞ্জন করিতে কত মিনতি করিলেন।

"রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটাই।
দুহুঁ করে দুহুঁ পদ ধরি রহু মাধব তবহুঁ বিমুখ ভেল রাই॥"
"এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহি তবু নাহি হেরল বয়ান।"

দূতী আসিল। তাহাকে দেখিতেই তিনি ঘুরিয়া বসিলেন।

"হেরইতে রাই বিমুখ ভৈ বৈঠল।"

দূতী অনুনয় করিয়া বলিল৭—

"সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোমারি অবধি করি নিশিদিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান॥"

শ্যাম এখন,

"চমকি উঠি ঘন কাঁপি মুরছল
আধ নাম লেই তোর।
মানিনি গো কি হিয়া নাহি জাগ॥"

দূতী প্রশ্ন করিয়া বলে,—

"চাঁদবদনী তুহুঁ রামা, কাঁহে ভেলি অতি বামা।"

কিন্তু কিছুতেই রাইয়ের মান উপশমিত হইল না।

"কানু উপেখি রাই মহী লিখই
মানিনী অবনত মাথ।"

যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাহার উপরই এইরূপ নিদারুণ মান সম্ভব। রুদ্ধ আবেগে অন্তরে অন্তরে তাহা ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জিতে থাকে।

দূতী সখী ও শ্যামের শত অনুনয় বিনয়েও তিনি শান্ত হইলেন না।

শ্লেষের সহিত বলেন,—

"জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলী রজনী গোঙায়লি
তাহি করহ অনুরাগ॥"

ইহা কত বড় অভিমানের কথা।

জ্ঞানদাসের রাই বিলাপ করিয়া বলেন, আজ আমার সকল মনস্কামনা চূর্ণ হইয়া গেল।—

"চন্দন তরু বলি বিখতরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূর গেল॥"
"পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে একপাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুম কিয়ে গাঁথয়ে মাল॥"

তিনি শ্লেষের সহিত বলেন,—তাই —সেই কপট শ্যামের,—

"হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার,
বিষঘট উপর দুধ উপহার॥"
"অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥"

কৃষ্ণ আসিয়া শতপ্রকারে কাকুতি মিনতি করিলেন।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয়॥"
"রামা হে ক্ষম অপরাধ মোর।
মদন বেদন সহন না যায়
শরণ লইনু তোর॥"
"চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতুলি॥"

তবু কোনো ফল হইল না। "অবনতবয়নী রহিল—অভিমানে অবনতমাথ" কৃষ্ণ আবার বলিলেন,—হে রাই তুমি কি জাননা—

"জপতপ তুহুঁ সকলি আমার করের মোহন বেণু।"
"দেহ গেহ সার সকলি আমার
তুমি সে নয়নের তারা।
আধ তিল আমি তোমা না দেখিলে
সব বাসি আন্ধিয়ারা॥"
"অবনীর ধুলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শত বাণ হৈয়া কাছে নাহি তোষে॥
চাহ চাহ মুখ তুলি চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাই তুয়া চরণের ধুলি॥"

এতেতেও তবু রাই তেমনি অটল, অচল।

দূতী আসিয়া কত বুঝাইল।

"সুন্দরি কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিকমুকুটবর নাগর চরণে হি সাধয়ে কান॥
কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে, গুরুতর কৌশল মোর।
লাখ লছমী যৈছে, চরণে লোটায়ই, তাহে এত বিরকতি তোর॥"

সখিগণ কত সাধিল।

"সখিগণ মেলি বহু বচন কেল।
মানিনী শুনি কছু উতর না দেল॥"

এক সখী বলিল,—

"কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি তব কাঁহারাখবি মান।
কোটী কুসুমশর হিয়া পর বরিখব তব কৈছে ধরবি পরাণ॥"

রাই তবুও নিরুত্তর।

"অবনত বয়নে রহিল অভিমানিনী।"

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও অপর বৈষ্ণব কবির রাই মানে কৃষ্ণের উপর অতিশয় রূঢ় হইয়াছেন, উপেক্ষা করিয়াছেন, রোষ, কোপ দেখাইয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাই স্বতন্ত্র, ইঁহাদের রাই হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনিও মান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্রোধ, শ্লেষ, বা ব্যঙ্গ করেন নাই। তাঁহার মান অভিমানের সুর মমতা মাখানো, স্নেহকরুণায় ভরা।

চণ্ডীদাসের রাই বলেন,—

"সকলি আমার দোষ হে বন্ধু সকলি আমার দোষ।
কাহারে করব রোষ॥"

তীব্র অভিমান কাহাকে বলে তাহা তাঁহার ধারণাতীত।

তিনি বড়জোর বলেন,—

"যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে সে তারে পাসরে কেনে?"
"মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব॥"

তাঁহার চক্ষে বারিধারা দেখা যায়, কিন্তু তাহাকে অভিমানের অশ্রু বলিয়া মনে হয় না।

তবে একথা ঠিক তাঁহারও মান সহজে উপশমিত হয় নাই। তাঁহার মনের বেদনা মানকে অবলম্বন করিয়া জ্বলিতে থাকে। যিনি কুশশীল মান, মর্য্যাদা, জীবন যৌবন সমস্তকে দলিয়া শ্রীকৃষ্ণে নিজকে অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্যাম-সুন্দর যদি উপেক্ষা করেন, প্রতিনায়িকার কুঞ্জে যাপন করেন সারা নিশি, তাহা হইলে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়? রাইয়ের অন্তর ব্যথার দহনে জর জর হইতে থাকে।

শ্যাম আসিয়া যখন —

"গলে পীতবাস করিয়া সাহস দাঁড়াল রাইএর আগে।"

রাই তখন—

"রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি নাগরেরে পাড়ে গালি।"

এ মানলীলায় একটা অকৃত্রিম মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনি অভিমানভরে বলেন,—

"সাধিলে মনের কাজ কি আর বিচার।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম আমার।।"

এই স্থানে তিনি উচ্চতম প্রেমসম্বন্ধকে পতিপত্নীর লৌকিক সম্বন্ধে নামাইয়া যে ভাবপ্রকাশ করিলেন, এইরূপ অভিমানচিত্র আর কিছুতেই ফুটিতে পারে না। প্রেমের পাত্রকে ভক্তির পাত্র করিয়া তিনি হৃদয়ের জিনিসকে মাথার মণি করিয়া নিকটকে দূর করিলেন। ভক্তি প্রেমের নিম্নস্তরের অবস্থা—রাই শ্যামকে সেই ভক্তির ভয় দেখাইলেন। দাস্যরসে নামিয়া আসিয়া শ্যামকে দণ্ড দিলেন। মাধুর্য্যরস হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস। ইঁহাদের রাইয়ের উত্তুঙ্গ মান-শৈল কিছুতেই বিগলিত হইল না।

অবশেষে মানজনিত দীর্ঘবিরহ আনিল একটা আক্ষেপাভিমান তাঁহার মনে।—আশঙ্কার সহিত অনুতাপ।

তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন,—

"কি কহব অগে সখি মোর অগেয়ানে।
সগরিও রয়নী গমাওল মানে।।"
"নারী স্বভাব কয়ল হমে মান।
পুরুষ বিচখন কে নহি জান।।
আদরে মোয়া হানি গয়ে ভেল।
বচনক দোষ পেম টুটি গেল।।" বিদ্যাপতি

"খেমহ এক অপরাধ মাধব, পলটি হেরহ তাহি।।
তোহ বিনা যদি অমিয় পীউতি, তই অওন জীউতি রাহি।।
তুহুঁ জৌ অবতাহি তেজব, ই অতি কওন বড়াই।
তোঁহ বিনু যব জীবন তেজব সে বধ লাগব কাঁহ।।" বিদ্যাপতি

"আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরনু, সো বহু বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সহ অহনিশি জ্বলত পরাণ।।"
"যাকর চরণ নখরুচি হেরইতে মুরছয়ে কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায় পালটি না হেরল হাম।।
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগী।
ব্রজকুলনন্দন চাঁদ উপেখলু দারুণ মানক লাগি।।" গোবিন্দদাস

"সজনি কাহে মোহে দূরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব রোখে বিমুখী ভৈগেল।।
গিরিধর নাহ গেনু ধরি সাধল হাম নহি পালটি নেহারি।
হাতক লছমী চরণপর ডারনুঁ অব কি করব পরকারি।।"
"তুহুঁ সনে মান করল বরমাধব হাম অতি অলপ পরাণ।
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ তাপে বাঢ়ায়লি অবহুঁ টুটায়ব কেহ।।
সব অপরাধ ক্ষমহ বরমাধব তুয়া পায়ে সোঁপলু পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদগদ হেরইতে রাইক বয়ান"।। গোবিন্দদাস

যে চাঁদের সুধাদানে জগৎ জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেন আমারে পোড়াও।।
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোণা শতগুণ হইয়া কাহে নাহি তোষে।।
সে চরণ ধুলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি কর পরসাদ।।"
"পরাণ কান্দে বধূ তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া।।
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে যায় প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি।।" জ্ঞানদাস

"ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া, বঁধুরে হারাইয়া ছিলাম।
শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর, দেখিয়া পরাণ পেলাম।।
সই জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন তাহার পরশ পাইয়া।।
তোরা সখিগণ করহ সিনান আনিয়া যমুনা নীরে।
আমার বঁধূর যত অমঙ্গল সকলি যাউক দূরে।।" চণ্ডীদাস

আজ তাঁহার মনে জাগিল কত পূর্ব্ব সুখস্মৃতি—অভিসার মিলন, দানকেলি কথা, ভুজে ভুজলতা বাঁধিয়া বনে বনে নিশা জাগরণ—আর হইল অনুশোচনা, খেদ, আত্মগ্লানি।

এই অনুতাপ, এই আক্ষেপ, অশ্রুধারা নির্ব্বাপিত করিল রাইয়ের অন্তরের মানের আগুন। মানান্তে পুনরায় ঘটিল মিলন।

এখন প্রশ্ন—এই মিলনলীলায় মানচিত্রের কি সার্থকতা?—মানলীলা না হইলে রসোৎসবের পূর্ণতা হয় না। প্রেমের মূল্য মর্য্যাদাও বাড়ে না। প্রেমকে পূর্ণাঙ্গ, গূঢ় ও গভীর করিবার জন্যই মাত্র অভিমানের প্রয়োজন। মান, অভিমান, কলহ, কোপ, অভিযোগ, অনুযোগ, অসূয়া, অমর্ষ,—প্রেমকে নব নব রূপে, নবনব মাধুর্য্যে, রসে, বৈচিত্র্যে পূর্ণ করে। মান আত্মশক্তিকে, চিনিতে,

জানিতে সহায়তা করে। মান হৃদয়ের অজানা বৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। এই মান রাইকে শক্তির প্রেরণা দিয়াছে। তাঁহাকে প্রেমরণরঙ্গিনী করিয়া তুলিয়াছে—কঠিন পাষাণের মত বাধা দিয়া তাঁহার প্রেমকে কলমুখর করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিগণ এই সব মান অভিমানের চিত্রের দ্বারা ভগবানকে আমাদের প্রিয়জন, নিকট আত্মীয়, ঘরের লোক করিয়া আনিয়াছেন।

ভগবান যে বিরাট, মহান, ভয়ালই শুধু নন, ধরাছোঁয়ার অতীত নন, তিনি যে রক্ত মাংসের মানবমানবীর সঙ্গে প্রেম করেন, প্রেম করিতে চাহেন, মান, অভিমান, কলহ, অভিযোগ, অনুযোগে রত হন, --একথা তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীতে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। রাই কৃষ্ণের উপর মান করিয়াছেন—সাধারণ মানবীর মত। অভিযোগ, অনুযোগ, কোপ, কলহ করিয়াছেন। কৃষ্ণভগবানও সাধারণ দেহীর মতই তাঁহার মানভঞ্জন করিতে শত অনুনয়, কাকুতি, মিনতি করিয়াছেন। সাধারণ মানবের মত তিনিও মান, কলহ, অভিযোগ, অনুযোগে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

মান প্রণয়লীলার একটা বিশেষ অঙ্গ। পদাবলীকাব্যে ইহা গতানুগতিকার সীমা অতিক্রম করিয়া লোকোত্তরতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই মানই রাধাশ্যামের প্রেমকে গভীরতমে লইয়া গিয়াছে। ঐশ্বর্য্যবোধ, সংস্কার, বন্ধন--সর্ব্বপ্রকার ব্যবধানের বিলোপ সাধন করিয়া দিয়াছে—তাঁহাদের— এই মানের আপাত ব্যবধান। এইখানেই শ্রীরাধা শ্যামময়ী হইয়া পড়িয়াছেন।

গোপীপ্রেমে মান একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা রসের নিদান। প্রেমরসের বিচিত্র উচ্ছ্বাস। নদীর স্রোত ধারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে, উহা যেমন উচ্ছ্বসিত, স্ফীত হইয়া তটিনীর বক্ষকে সমুচ্চ ও গৌরবময় করিয়া তোলে, মানের বাধায় প্রেম-নদীরও সেই অবস্থা প্রাপ্তি হয়।

মান প্রেমেরই সমুচ্চ, স্ফীত, গৌরবময় ভাব বিশেষ। মানেই কাঁদাইয়া কাঁদা সম্ভব এবং ইহাই পীড়ন করিয়া পীড়িত হওয়া,—গভীর অতি লৌকিক প্রেমের ধর্ম।

গীতগোবিন্দে এই মানভঞ্জনে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

সাধারণ দেহীর মতই তিনি এই বিনীত প্রার্থনা করিয়াছেন। যিনি অনন্ত কোটী কোটী অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বেসর্ব্বা তিনি তাঁহার আরাধিকা ও সাধিকার

মানভঞ্জনের জন্য তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার পদযুগল শিরে ধারণ করিতে প্রয়াসী।

বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ বলেন—সসীমে অসীমে এই লীলা একদা সম্ভব হইয়াছিল—বৃন্দাবনে। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময়ী রাধাশ্যামের লীলাভূমি বৃন্দাবনে। মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের প্রত্যক্ষ প্রাকৃত মিলন ঘটিয়াছিল।

সেদিন অসীমকে সীমার বন্ধনে আনিয়া এই সুমধুর লীলা সংঘটিত হইয়াছিল—স্নেহের ডোরে যশোদা, প্রীতির বন্ধনে শ্রীদাম, সুদাম সুবলাদি, প্রেমের ফাঁসিতে রাইধনি ও গোপীগণ—সেই চিরসুন্দরকে একবার বাঁধিয়াছিলেন—ব্রজধামে। তাই বৃন্দাবনের রজঃ আজিও ভক্তসাধকের রোমাঞ্চ শিহরণ জাগায়।

বৈষ্ণব কবিকুলের এই মানের চিত্রকে প্রাকৃত মান অভিমান যদি বলা হয়, তাহাতেও আপত্তি করা চলে না। কারণ ইহার মধ্যে কোনো প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত নাই। তবে রাধাশ্যামের ভাগবতস্বরূপই ইহাতে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দিয়াছে।—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কাব্যরসের দিক দিয়া ইঁহাদের অঙ্কিত মানের চিত্র রসোত্তীর্ণ। ইঁহারা যে ভাষায় শ্রীরাধার মান ও আক্ষেপাভিমান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সার্ব্বজনীন আবেদনে (universal appeal) পরিণত হইয়াছে।

ইহা যেন যুগযুগান্তরের, দেশদেশান্তরের সকল রাধারই মান অভিমানের বাণীরূপ।

বিরহ ও মাথুর

শ্রীরাধার বিরহ ও মাথুর চিত্রে বৈষ্ণব কবিকূলের কবিত্ব যেমন নির্ম্মল, প্রগাঢ় ও প্রদীপ্ত হইয়াছে তাহা আর কোথাও নহে। তাঁহাদের বিরহ গানের ভাব-সুরধুনী অসীম প্রেমসমুদ্রে গিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রেম ও ভক্তি অশ্রুজলে তাঁহারা সকল মলিনতাকে যেন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। দেহজ রূপের বর্ণনা সংযত, অলঙ্কারের নূপুরনিক্কন নীরব। শুধু বিচিত্র সুবিমল সকরুণ ভাবরাশি প্রবহমান। শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় মলিনা আজিকার রাই। নাই পূর্ব্বের সেই মুখর, চটুল বাক্যচ্ছটা। নাই সেই গরবিনী বেশবিন্যাস। নাই হাস্য, লাস্য, বিলাস, উল্লাস, উচ্ছ্বাস। নাই কুটীল কটাক্ষ, লীলায়িত গতি, নাই কূলে-কূলে-ভরা-দেহ-যমুনার যৌবন-তরঙ্গ-হিল্লোল। শ্যাম বিনা আজ সকলি শূন্য।

বিদ্যাপতির রাই বিলাপ করিয়া বলেন,—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥"
"কৈছনে যাওব যমুনাতীর।
কৈছে নিহারব কুঞ্জকুটীর॥"

আমার মুখের হাসি, নয়নের নিদ্রা প্রিয়তমের সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে।

"নয়নক নিঁদ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাশ॥"

আজ আমার—

"পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেল"।
"যৌবন জনম বিফল ভেল।"

তৈলশূন্য প্রদীপের মত জ্বলে আমার প্রাণ।

"বিনু সিনেহ বরই জনী দীবে।"

হে প্রিয় তুমি নহিলে আমার দিবারাত্রি কেমন করিয়া কাটে। আমি যেন ছিন্ন মালতীর মালা বিপথে পড়িয়া রহিয়াছি।—

"হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈসে মালতীক মালা॥
কি কহসি কি পুছসি প্রিয় সজনী।
কৈসে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥"

বিদ্যাপতির কাব্যে বিরহবিধুরা রাইয়ের এই কাতর বিলাপোক্তির অন্ত নাই।

"ললিত লতা জনি তরু মিলতী। তহি পিঅকণ্ঠ গহএ জুবতী॥"
আজু আপন মন থির ন রহে। মধুকর মদন সমাদ কহে॥"

ললিত লতা তরুর সহিত যেমন মিলিত হয়, সেইরূপ যুবতীগণ প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না। আজ আমার মন যে স্থির থাকে না, মধুকর মদনের সম্বাদ কহিতেছে।

তিনি বলেন,—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব কে দূর করব পিয়াসা।
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগি॥"

"শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু ন বরিখব",—তাহা হইলে কে কি করিতে পারে?

রাই কাতরে কহেন, তোমার আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া আর কতকাল থাকিব হে প্রিয়?

"নখর খোঁয়ানু দিবস লিখি লিখি।
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ পেখি॥"

এমনি করিয়া নৈরাশ্যে, দুঃখে বেদনায় উৎকণ্ঠায় রাইয়ের দিন যায়। বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়। রাধার বুক চিরিয়া অধিকতর হাহাকার উঠে। হুতাশ-বেদনায় তিনি বলেন,—

"সরসিজে বিনু সরসর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনুতন তনু বিনু যৌবন কী যৌবন পিয় দূরে॥
চৌদিশ ভ্রমর ভম কুসুমে কুসুমে রস নীরসি মাঁজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ বিরহিনী কৈসে জীবই॥"

তারপর একদিন ঘনঘটা করিয়া বর্ষা নামিয়া আসে। নবঘন আকাশে, ঝঞ্ঝা গরজন, কুলিশপাত, বিদ্যুতের দহন জ্বালা।—শ্রীরাধিকার বিরহ লক্ষগুণে বাড়িয়া যায়। তাঁহার হৃদয় ফুকারিয়া কাঁদিয়া কহে,—

"ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"
"ধারা সবন বরষ ধরণীতল।
বিজুরি দশদিশ বিন্ধই॥
ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনী।
বিরহিনী কৈসে জীবই॥"
"সজনি আজ শমন দিন হোই।
নব নব জলধর চৌদিক ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকষয় মোয়॥"

রাই বলেন—বসন্তকে কোনো প্রকারে উপেক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এই দারুণ বর্ষাকে কেমন করিয়া সহিব? ধবলগিরি হইতে কৃষ্ণ মেঘ আসিয়াছে, তাহাকে কি করিয়া নিবারণ করিব?

"বরিষয় লাগল গরজি পয়োধর ধরণী দস্তুদি ভেলি।
নবী নাগরী রত পরদেশ বল্লভ আওত আশা দূর গেলি ॥"

তিনি বলেন, এইভাবে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

"সুরসরি তীরে শরীর তেজব সাধব মনক সিধি।"
দুলহ পহু মোর সুলহ হোয়ব অনুকূল হোয়ব বিধি ॥"

—হে বঁধু—তুমি বিনা আমি আর প্রাণধারণ করিতে চাহি না। সখি তোরা আমার কর্ণকুহরে শ্যামনাম কর—শুনিতে শুনিতে যেন এই "কঠিন পরাণ" বাহির হইয়া যায়।

"শ্রবণহি শ্যামনাম করু গান।
শুনইতে নিকষয় কঠিন পরাণ ॥"

কত আর দেখাইব! চিত্রের পর চিত্রে বিদ্যাপতির রাইয়ের এই শোকোচ্ছ্বাস সমগ্র বিশ্ববাসীর অন্তরকে কাঁদাইয়া ভাসাইয়া দেয়। মানবহিয়ার চিরন্তন বিরহ-বেদনাকে যেন জাগাইয়া তোলে।

বিদ্যাপতির ভাবধারা বিরহে যেরূপ প্রদীপ্ত, পবিত্র ও প্রগাঢ় হইয়াছে, গোবিন্দদাসে ঠিক ততটা দেখি না।

তাঁহার রাইও বিলাপ করিয়া বলেন,—

"কেন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহল ॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিশ্চয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥"

বিদ্যাপতির রাইয়ের ন্যায় তাঁহার রাইও বলেন,—

"নখর খোয়ায়লু দিবস লেখি লেখি।
নয়ন অন্ধুয়া ভেল পিয়া পথ দেখি ॥"

তিনি অধীর হইয়া কাঁদিয়া কহেন,—

"পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো।
নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥"
সখিহে বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া।
এই বিধি লিখিল করমে ॥"

বর্ষার দিনে তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া অহোরাত্র অশ্রু ঝরিয়া পড়ে

"নীরদ মুরতি নয়নে যব লগয়ে নিঝরে ঝরয়ে দিনরাতি।"

তিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়েন।

"হরি হরি বলি মুরছি মহী রহই।"

চেতন পাইয়াও তাঁহার মুখে অন্য কোনো কথা থাকে না, শুধু—

"গদ গদ কহে শ্যাম নাম।"

তবু মনে হয় যেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ন্যায় আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতনা তাঁহার রাইয়ের বিরহের গানে নাই। ভাবের সে গভীরতা নাই।

মাথুর-বিরহের পদে বিদ্যাপতি অলঙ্কারের লোভ সংবরণ করিয়া তাঁহার বিরহ-গানের সুরলহরীকে দেশকালের সীমা উত্তরণ করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দদাসে তাহা হয় নাই।

চণ্ডীদাসের রাই বিরহে কোথাও বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের রাধিকার মত দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ, মরমের জ্বালায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। চণ্ডীদাসের রাধা বিরহেও প্রিয়তমের ধ্যানে তন্ময়। তাঁহার শান্ত, পাণ্ডুর মুখকমলখানি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের রাইয়ের মত খেদে লজ্জায় আরক্তিম নহে। তাহা যেন অসীম কারুণ্যে ভরা।

তাঁহার রাই যেন কঠোরা যোগিনী।

"নিজ কায়াপর রাখিয়া কপোল।
মহা যোগিনীর পারা ॥
ও দুটি নয়নে বহিছে সঘনে।
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥"
"যেন চান্দের রসের লাগিয়া চকোর থাকয়ে ধ্যানে।"

তিনি এমনি আত্মহারা হইয়া থাকেন,—

"যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।"
"পুছয়ে কানুর কথা ছলছল আঁখি।"

সর্ব্বক্ষণ শ্যামনাম জপ করেন—

"শ্যাম মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে চায়।"

তিনি বলেন,—

"পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো ॥"

তিনি কিছুতেই যখন মন বাঁধিতে না পারেন, তখন আকুল হইয়া বলেন,

"কালার লাগিয়ে হাম হব বনবাসী।"

তিনি উদাসী যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিতে চাহেন।

"দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পড়িব কুণ্ডলে ॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥"

কিন্তু এত দুঃখ এত কষ্টেও তিনি কানুকে ছাড়িতে চাহেন না, কানু চিন্তাহারা হইতে কামনা করেন না। শত নৈরাশ্য, বেদনার মাঝেও তিনি বলেন,—

"কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন ও দুটি নয়নতারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতুলি নিমিখে নিমিখ হারা।।"

কানু না থাকিলে কি, তিনি সর্ব্বত্রই কানুকে দেখেন,—

"গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া ভোজনে কালিয়া কানু।
ভ্রূযুগ মুদিলে সেখানে কালিয়া কালিয়া হইল তনু।।"

বিরহে এমন যে আত্মহারা ভাব হইতে পারে, ইহা স্বপ্নাতীত। কোনো বৈষ্ণব কবিতেও ইহা নাই। চণ্ডীদাসের বিরহিনী রাধিকা যেন প্রেমসাধিকা। অনুরাগের হোমবহ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া শ্যাম-সূর্য্যের পানে চাহিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্না।

তাঁহার মুখে অভিযোগের স্বর অতি নম্র, করুণ।

"সকল ত্যজিয়া শরণ লয়েছি ও দুটি কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল ওহে বংশীধর কি তব উচিত হয়।।"

তিনি বলেন—হে প্রিয় তোমার জন্য আমি—

"রাতি কৈনুঁ দিবস দিবস কৈনুঁ রাতি।
ঘর কৈনুঁ বাহির বাহির কৈনুঁ ঘর।
পর কৈনুঁ আপন আপন কৈনুঁ পর।।"

তোমার কি দয়া হইতে নাই? তোমার উপেক্ষার মাঝে আমি বাঁচিতে চাহি না।

"বঁধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।"

মরিতে চাহেন—কিন্তু সে মরণ যেন শ্যামসুন্দরের সম্মুখে হয়। নতুবা তাহার মরিয়াও শান্তি নাই।

এ হেন মানসিক দুঃখেও তাঁহার মুখে তীব্র বাক্য জ্বালা নাই। তাঁহার মনে, দেহে, বাক্যে, কি সংযম! সখিকে কানু সকাশে প্রেরণ করেন যখন, তখনও ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, শ্লেষ নাই বাক্যে,—আছে শুধু বিনীত অনুনয়।

"সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে করিবে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ।।"

বলো সই তারে—তোমার স্নেহের রাই মরিতে বসিয়াছে, মরিবার আগে বারেক তোমাকে দেখিতে চায়।—এইটুকু মিনতি তাঁর।

জ্ঞানদাসের রাই বিরহে কোথাও বিদ্যাপতি, কোথাও বা চণ্ডীদাসের রাইয়ের অনুগমন করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির রাইয়ের মত বিলাপ করিয়া তিনি বলেন,—

"আর না যাইব সই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে।।
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া।।"

কখন বলেন,—

"পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল।
দিবস লখিতে নখ গেল।।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল।
বরিখে বরিখ কত ভেল।।"

তবু প্রিয় তুমি আসিলে না। আমার সকলি যে বৃথা হইল।

"কি মোর করমে লেখি।"
"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর করমে লেখি।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে।।"

তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি কখন অনুযোগ করেন,—

"যখন আমাকে সদয় আছিলা
পিরিতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি হইলে বিরাগী
নিদয় হইলে দড়।।"

আবার চণ্ডীদাসের রাইয়ের মত কাকুতি করিয়া বলেন,—হে প্রিয় তুমি কি জাননা আমার,

"তোমা বিনা তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই।"

অন্যত্র বলেন,

"পরাণ কাঁদে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া।।"

তোমার অদর্শনে আমার যে—

"ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি।।"

চণ্ডীদাসের রাই যেমন বলেন—"পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।" তেমনিভাবে জ্ঞানদাসের রাইও বলেন—"তবু সে বঁধুরে আমি পাসরিতে নারি।"

তিনি তাঁহার মতই উদাসী যোগিনী হইতে চাহেন।—যোগিনী সাজিয়া দেশে দেশে শ্যামসুন্দরকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিবেন।

"মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সই পিয়া না আইল।
এ হেন যৌবন পরশ রতন কাচের সমান ভেল।।
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি।।"

অন্যত্র তিনি চণ্ডীদাসের রাইয়ের মত বলেন—"বঁধুর লাগিয়ে মুঞি হব বনবাসী।"

কখন আবার চণ্ডীদাসের রাইয়ের মত মরণ কামনা করেন। তিনি বলেন—মরণে দুঃখ নাই, তবে দুঃখ এই শুধু—

"পুনঃ নাহি হেরব সে চান্দবয়ান।"

জ্ঞানদাসের রাই বিরহে এইরূপ বহুস্থলে চণ্ডীদাসের রাইয়ের অনুসারিনী ও অনুগামিনী হইলেও চণ্ডীদাসের রাইয়ের সে আত্মবিস্মৃত ধ্যানমগ্নতা, অন্তর্দেশের সে অতলস্পর্শ গভীরতা, সে সকলভোলা আত্মহারা প্রেমতন্ময়তা তাঁহাতে দেখি না।

তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে—তন্ময়তার কিছু তারতম্য, পরিস্ফুটনের পন্থা কিছু বিভিন্ন হইলেও সকল বৈষ্ণব কবির রাধাই বিরহের চরম অবস্থায় আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণময়ী হইয়া গিয়াছেন।

"তন্মকান্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকা" হইয়াছেন।

বিরহে তাঁহাদের কৃষ্ণগতপ্রাণা রাইয়ের সকল বিষয়ে অনাসক্তি, সুখে-দুঃখে, আশায় নৈরাশ্যে, আনন্দ বেদনায় সকল বাহ্যবস্তুতে একটা বৈরাগ্য, তাঁহাদের কাব্যে এক লোকোত্তর রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

তাঁহাদের রাইয়ের এই বিরহ জগতের সকল দেশের সকল বিরহগাথার সকল Convension ছাড়াইয়া গিয়াছে।

যাহার সহিত ব্যবধান ঘটিবে বলিয়া রাই অঙ্গে বসন, চন্দন, হার পর্য্যন্ত রাখিতেন না, পুলকসঞ্চারেও অঙ্গের সহিত অঙ্গের দূরত্ব ঘটার আশঙ্কায় পুলক দমন করিতেন, সে কিনা আজ গিরিনদীর অন্তর হইয়া গেল। "সো অব গিরিনদী আঁতর ভেলা।"

চিরশ্যাম বৃন্দাবন হইতে মথুরায় চলিয়া গেলেন। স্বপ্নলোক (বৃন্দাবন) হইতে বাস্তবলোকে (মথুরা) বিদায় লইলেন। জীবন সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে। রাধিকার স্বপ্নভঙ্গ হইল। এই স্বপ্নভাঙ্গার করুণ বিলাপই মাথুর-বিরহ। রাধিকার হৃদয়ের আর্ত্তনাদ, হাহাকারের বুকফাটা গান।

বৈষ্ণব কবিগণ মাথুরগানে রাধা বিরহের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, সে ব্যথা-বেদনার কথা ভাষায় বুঝি বোঝানো যায় না। এই মাথুরে বিরহ বেদনাধারার সীমাহারা স্ফীতি ঘটিয়াছে।

মথুরা যাওয়ার ক্ষণপূর্ব্বে শ্যামের সহিত রাইয়ের যে শেষ বিদায় মিলন হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত কি করুণ!—আলিঙ্গন স্পন্দহীন, চুম্বন অশ্রুসিক্ত, শিথিল ভুজবন্ধ।

"নিবিড় আলিঙ্গনে রহ পুনবন্দ। দরদর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ॥"

তারপর কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন। রাই সকাতরে বলেন—দুই চোখ মেলিয়া তাহা কি করিয়া দেখিলাম! তাহা দেখিয়া কেমন করিয়া শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলাম! কেন ফিরিলাম!

তিনি বৃন্দাবনের বন, পথ, মাঠ, প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান পাগলিনীর ন্যায়। কত লীলামাধুরীর চিহ্ন নয়নগোচর হয়। হৃদয় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠে। সখীদের কাঁদিয়া কহেন—একবারের তরে তাকে ব্রজপুরে আসিতে বলিস্। আমি যদি মরি তবু সে যেন আসে,—আমার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গেলাম, সে যেন দেখে।

"নিকুঞ্জে রাখিলুঁ মোর এই গলার হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরুশাখায় রহিল শারি শুকে। মোর দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী। পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥"

এই মাথুর বিরহে শ্যামহারা বৃন্দাবনভূমির সর্ব্বত্র কি কারুণ্য! সারাপ্রকৃতি বিষাদময়ী!

"শারি শুক পিক না কুকরত কোকিল না পঞ্চম গান।
কুসুম তেজি অলি ভূমিতলে লুটই, তরুগণ মলিন সমান॥"

কেবল প্রকৃতি নয়, সখাগণ, সখিগণ, অভাগিনী জননী যশোদা সকলেরই চক্ষে দিবানিশি দরদর ধারা।

বৃন্দাবনধামের সেদিনের চিত্র অতি মর্ম্মন্তুদ, অতি করুণ। আজিও মানবহিয়া আকুল করিয়া রাখিয়াছে।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়। শ্যামের ফিরিবার ক্ষীণ আশাও লুপ্ত হয়। রাই বড় ক্ষোভে বলেন—আমার এ দগ্ধ হৃদয়ের কথা তাহাকে কেমন করিয়া জানাইব? এ যে কি জ্বালা! কানু যদি কখন রাধা হয় তবেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তাই কামনা করেন,—

"কামনা করিয়া সাগরে মরিবু সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে॥

মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরিতি কেমন জ্বালা॥"

বিচ্ছেদ বেদনার কি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। কি নিদারুণ বিরহের প্রকাশ! ইহাই মাথুর। এই মাথুর বিরহের গান গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে, পথে, মাঠে, ঘাটে, বিজনপ্রান্তরে, অরণ্যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী গীত হইয়া, মানবহিয়াকে উদাসীন করিয়াছে। ধনী, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, সুখী, দুঃখী—নির্ব্বিশেষে সকলের মনকে ক্ষণকালের জন্যও কাড়িয়া অজানা অনন্তের উদ্দেশে লইয়া গিয়াছে, মহাসৌভাগ্যবান চিরসুখীকেও ক্ষণিকের জন্য বেদনাবিধুর করিয়া তুলিয়াছে, অসদ্ সদ্, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের চক্ষেই অশ্রুর বন্যা আনিয়াছে।

এ যে কি বিরহ—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কত বড় ব্যথায় রাই বলেন—"কানু বিনু জীবন কেবল কলঙ্ক।"

"ক্ষণ রহু জীবন বড় ইহ লাজ।" তিনি বলেন—কেন এছার প্রাণ যায় না? "না যায় কঠিন প্রাণ।"

এই বিরহে সকল সম্ভোগ, বিলাস, ব্যসন কোথায় ভাসিয়া যায়। ইহা সর্ব্বগ্রাসী বৈশ্বানরের মত। দেহকে পোড়াইয়া, দহিয়া, জ্বালাইয়া দৈহিকতা বিলুপ্ত করিয়া দেয়। জাগাইয়া তোলে নিষ্কলঙ্ক বিদেহ প্রেম অন্তরে। আনিয়া দেয় মনে কঠোর সংযম ও বৈরাগ্য। আর্য্য ঋষিগণ যে দুশ্চর তপস্যার কথা বলেন, এই বিরহ সেই তপস্যা। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীমতীর বিরহে তাহাকেই রসময় রূপদান করিয়াছেন। এই বিরহ—চিরকাম্যকে পাওয়ার কঠোর সাধনা ভক্তের। শ্রীরাধিকা এই তপস্যানলে ধূপের মত পুড়িয়া নিজ সুরভিতে যুগে যুগে মানবহিয়াকে আকুল করিয়া রাখিয়াছে।

এ সেই বিরহ যাহা ঘটায় দিব্যোন্মাদ। এই দিব্যোন্মাদে রাই—

"খেনে উচ্চ রোয়ই খেনে পুন ধাবই খেনে পুন খল খল হাস।
চীত পুতলি সম খেনে পুন হোয়ই প্রলাপই খেনে দীর্ঘশ্বাস॥"

এ সেই বিরহ যাহা ভেদজ্ঞান, অহংজ্ঞান বিলোপ করিয়া দিয়া জীবকে "তত্ত্বমসি"তে পরিণত করে। শ্যামের ধ্যানে আত্মবিস্মৃত হইয়া রাই নিজেকেই মাধব ভাবিয়া তত্ত্বমসি হইয়াছেন।

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেল মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল
অপন গুণ অনুধাই॥"
"আপন বিরহে আপন তনু জরজর
জীবইতে ভেলি সন্দেহা॥"

রাধার শ্যামের সহিত অভেদজ্ঞান জন্মিল। ইহাই সমাধির অবস্থা। দ্বৈত-ভাবের পরিবর্ত্তে অদ্বৈতভাব, ভেদাভেদ জ্ঞানের তিরোভাব।

বৃন্দাবনের রাধা বিরহের এই যে হাহাকার, এ হাহাকার জগতের প্রতি ঘরে ঘরে। কত না রাধাই ঘর সংসারের হাজার স্মৃতি বুকে ধরিয়া অশ্রুপাত করিতেছে যুগে যুগে। শতস্মৃতি কণ্টকিত বুকে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কত অনুরাগিণী প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারিয়া দিবাযামিনী সরবে বিলাপ করিতেছে। রাধা বিরহের বাস্তব দিক পর্য্যন্ত এই সবের কতকটা মিল আছে।

কিন্তু বিরহজনিত রাইয়ের এই যে দিব্যোন্মাদ, এই যে তত্ত্বমসিতে পরিণতি, ইহা যেন সাধারণ দেহীতে সম্ভব নহে।

এইরূপ দিব্যোন্মাদ ও তত্ত্বমসিভাব পরিস্ফুট ও পরিমূর্ত্ত হইয়াছিল একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলের জীবনে। রাধা বিরহের অতিলৌকিক, আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত তাঁহার জীবনেই রসঘনরূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

এই রাধা বিরহ—নরনারীর প্রাকৃত বিরহের লৌকিক গণ্ডীর মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া অতিলৌকিক বিরহের,—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ বেদনার—বাণীরূপে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ণ, অসীম, নিত্যের সহিত অপূর্ণ, সসীম, অনিত্যের ব্যবধানজনিত যে চিরন্তন বিরহ, যে শাশ্বত হাহাকার; সাথে সাথে শোক দুঃখ ব্যথাসঙ্কুল জগত সংসারের যে প্রাকৃত বিরহ,—এই রাধা বিরহে তাহাই কাব্য রসময়রূপ লাভ করিয়াছে।

মিলন ও পুনর্মিলন

সাহিত্যে নায়ক নায়িকার মিলন চিত্রে মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য ও গভীরতার কথা ভাবিতে গেলে মাধুর্য্যরসের আকর পদাবলী সাহিত্যের কথা মনে পড়ে। এই মিলন চিত্র তাঁহাদের কাব্যের নায়ক নায়িকা রাধাকৃষ্ণের লীলাকথায় নানা ভঙ্গিমায়, নানা বৈচিত্র্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

রাগানুগাভক্তিপথের পথিক এই বৈষ্ণব কবিকুল, রাধাশ্যামের মিলনকে প্রাকৃত সম্ভোগলীলার ভিতর দিয়া অতি-প্রাকৃত ভাব-সম্মিলনে লইয়া গিয়াছেন। ভাবলোকের দেহাতীত সম্মিলনে রাধাপ্রেমের যে পরিণতি, সে প্রেম নয়ন রাগে জন্মলাভ করিয়া, স্তরে স্তরে ক্রমবিকাশের পথে বিকশিত হইতে হইতে যৌন সম্ভোগের ভিতর দিয়া অভ্যুন্নত হইয়া একদা অতিলৌকিক মানসমিলনে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই স্তরগুলিকে তাঁহারা যৌন আকর্ষণের ভাষায় রসরূপ দান করিয়াছেন। তাই প্রথম মিলনের পদগুলিতে রাগলীলার বর্ণনা প্রচুর। এই রাগলীলার ক্রমবিকাশ ধারা দেখাইতে তাঁহারা ধাপে ধাপে সাধারণী রতি, সঞ্চারী, স্থায়ী, সমঞ্জসা, সমর্থা হইতে মঞ্জিষ্ঠা রাগে উপনীত হইয়াছেন। রাধাশ্যামের পরস্পর স্থায়ী রাগ—এই মঞ্জিষ্ঠা।—যে রাগ কোনোপ্রকারেই বিনষ্ট হয় না, অন্যকেও অপেক্ষা করে না, নিরন্তর স্বীয় কান্তি দ্বারা বৃদ্ধি হয়।

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী হয়ত মনে করিতেন পঙ্কেই পঙ্কজের জন্ম হয়, লালসা কামনার মধ্য হইতেই নিকাম প্রেম জন্মলাভ করে। তাই ক্রমপরিণতির ধারা দেখাইতে যৌনমিলনকে তাঁহারা উপেক্ষা করেন নাই।

ইক্ষুরস যেমন পাক হইতে পাকান্তর লাভ করিয়া মিছরিতে পরিণত হয়, সেইরূপ রতিভার মহারাগে ঘনীভূত হয়। রতিভাবের ক্রমবিকাশের স্তরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, পূর্ব্বরাগ, প্রণয় সাধারণ রাগ সোপান পরম্পরা উদ্বর্ত্তিত হইয়া মহাপ্রেমভাবে স্থায়ীত্ব লাভ করে।

সাধক কবি বিদ্যাপতি বলেন—রাধাশ্যামের মিলন ঘটিয়াছিল। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার সাক্ষী আকাশের চাঁদ, ভ্রমর পদলেখনী, মধু মসী, ও দ্বিজ কোকিল লেখক। ইহারা মধুমিলন দেখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে।

"দ্বিজ পিক লেখক মসী মকরন্দা।
ঝাঁপ ভ্রমর পদ সাখী চন্দা॥"

তাহারা দেখিয়াছে—

"সুরত সমাপি সুতল বরনাগর। পাণি পওধর আপি।।"
"কণক শম্ভু জনি পুজি পূজারে। ধএল সরোরু হে ঝাঁপি।।"

—সুরত সমাপণ করিয়া পয়োধরে হস্তার্পণ করিয়া নাগরশ্রেষ্ঠ শয়ন করিল। যেন পূজারী স্বর্ণশম্ভু পূজা করিয়া পদ্ম দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। এই উপমা দ্বারা বিদ্যাপতি প্রাকৃত সম্ভোগ হইতে যেন এ সম্ভোগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন।

তিনি বলেন, এ মিলনে পদ্মপত্রে জল বিন্দুর ন্যায়—
ভাবোচ্ছ্বাসে শ্রীরাধিকার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল।

"জইসে ডগমগ নলিনীকনীরে।
তইসে ডগমগ ধনিক শরীরে।।"

চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল বসন্তের এক মধু নিশীথে নির্ম্মলচন্দ্র আকাশে প্রকাশমান, মলয়ানিল বহমান আর ভক্তকবি সখিরূপে পাশে বাসয়া ভাব গদ গদ হইয়া চামর ব্যজন করিতেছেন।

"আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাবভরে গদগদ চামর ঢুলায়ত পাশে রহি দ্বিজ চণ্ডীদাস।।"

এমন সুক্ষণে, সুলগ্নে—

"মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।"
"দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।"
"দোঁহার নয়নে নয়ন মিলল হৃদয়ে হৃদয় ধরে।"
"দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন উছলল প্রেমহিলোল।"

গোবিন্দদাস মানসনয়নে এই মধুমিলন দেখিয়া মুগ্ধবিমোহিত হইলেন।

"দুহুঁ রসে ভাসই দুহুঁ অবলম্বই রঙ্গ তরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ।
নবনাগরী সনে নাগর শেখর ভুলল গোবিন্দদাস পঁহু।।"

"তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেড়ল হেম।।
কণক লতায়ে জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরি রসাল।।
কমলে মধুপ জনু পাওল সঙ্গ।।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ।।"

এই সম্ভোগ-মিলন দর্শনে জ্ঞানদাসের মনের আনন্দের সীমা নাই।

"গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ানে রহু আবতি অনেক।।
সুখময় মন্দির কালিন্দীতীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ কুটীর।।"

"দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোণে।
দুহুঁ হিয়া জরজর মনমথ বাণে॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ কত মদনসাগরে ভেল ঝম্প॥
... ...
দুহুঁ আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল আনন্দ॥"

এইসব সাধক কবির অঙ্কিত প্রথম সম্ভোগমিলনের চিত্রও মনে হয় যেন সম্পূর্ণ পার্থিব নয়। এই সম্ভোগে যেন ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, ইহা "তিলে তিলে নূতন হোয়।" এ সম্ভোগলীলা যেন অসীম, অনন্ত, বিচিত্র ও অপূর্ব্ব। ইহাতে যেন শাশ্বত যৌবনের চির অতৃপ্ত মিলন তৃষারই জয়গান করা হইয়াছে।

বিদ্যাপতির রাই বলেন,—

"সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহো পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥"

এই পদে সম্ভোগের যে অতৃপ্ত বাসনা, মিলনের যে দুরন্ত আবেগ, রূপ দেখিবার পিপাসা, হিয়ার উপর হিয়া রাখিবার আকুলতা, মধুর বাণী শুনিবার তৃষ্ণা, এ সকলই যেন মর জগতের বহু উর্দ্ধে। ইহা সেই অতৃপ্তির বাণী, ইহা সেই প্রেমের কথা—যে প্রেম সম্ভোগে তৃপ্তি পায় না, বিরহেও দীপ্তি হারায় না।

গোবিন্দদাসের রাই বলেন,—

"রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশমিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আপন পরসঙ্গ॥"

জ্ঞানদাসের রাই কহেন,—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

পার্থিব, প্রাকৃত সম্ভোগ মিলনের অবসাদ ইহাতে নাই। এ সম্ভোগ যেন অফুরন্ত। ইহা মৃত্যুহীন চিরন্তন অতৃপ্তির বাণীই বহন করে।

বৈষ্ণব সাধক ও কবিগণ বলেন—এই সম্ভোগ মিলনের প্রয়োজন আছে। শ্রীমদ্ভাগবতও একথা স্বীকার করেন।

পরমতৃষ্ণা জাগাইবার জন্য রসময় রসের ঠাকুর অহৈতুক করুণা করিয়া গোপীগণের সহিত একবার মিলিত হইয়াছিলেন। কেন? তৃষ্ণাসাধনায় প্রণোদিত করিয়া বিরহ তপস্যায় নিমগ্ন করিতে। তিনি অন্তর্ধান করিলেন, রাখিয়া গেলেন রাইয়ের অন্তরে পরমতৃষ্ণা। নিদারুণ বিরহ। এই বিরহ-তপস্যার অনল দৈহিকতা ধ্বংস করিয়া রাইয়ের হৃদয়ে জাগাইল বিদেহ প্রেম। ইহাই আনিল রাইয়ের অন্তরে শ্যামের সহিত ভাব-সম্মিলন। ইহাকেই বৈষ্ণব কবিগণ পুনর্মিলন বলিয়াছেন।

এই পুনর্মিলনই ভাব-সম্মিলন। কারণ মথুরা গিয়া শ্যামসুন্দর আর কখন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই।

"অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনিক ধূপে, শ্যাম-বৃন্দাবনে।" কালিদাস

গভীর-বিরহে তন্ময় ও তদ্‌গত হইয়া রাধা অনুক্ষণ ভাবিতেন তাঁহাদের পুনর্মিলন হইল।—মহাভাবে মগ্ন রাইয়ের কৃষ্ণের সহিত দেহাতীত সম্মিলন ঘটিল।

পুনর্মিলনে রাইয়ের অন্তরে কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। বিরহ তপস্যায় তাঁহার সকল অবিদ্যার বিনাশ হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য ভস্মীভূত। তাঁহার চিত্ত মধুর নিষ্কাম কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ। শ্যামসুন্দরের সহিত নিত্যভাব-সম্মিলন।

বিনা সাধনা ও তপস্যায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে অচিরে হারাইতে হয়। তাহাকে চিরদিনের করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। ভগবানের অহৈতুক করুণায় গোপীগণ যে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন প্রথম মিলনে, তাঁহাকে হারাইতে হইয়াছিল। শ্রীমতী রাই বিরহ-তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে ভাব-সম্মিলনে চিরদিনের ধনরূপে পরে পাইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির রাধা বিরহে তন্ময় হইয়া কল্পনা করিতেছেন,—

"অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পলটি চলব হম ঈষৎ হসিয়া।।
আবেশে আঁচরে পিয়া ধরবে। জাওব হম জতন বহু করবে।।
কঁচুয়া ধরব জব হঠিয়া। করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া।।
রভস মাঁগব পিয়া জবহিঁ। মুখ মোড়ি বিহুসি বোলব নহি নহি।।
সহজহি সুপুরুখ ভমরা। মুখ কমল মধু পিয়ব হমরা।।
তৈখনে হরব মোর গেয়ানে। বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয় ধেয়ানে।।"

বিদ্যাপতি এই মিলনের কল্পনাকে —ধ্যান বলিয়াছেন। রসসাধকের রসঘন রূপের সহিত মিলনের কি রসময় চিত্র।

বিদ্যাপতির পুনর্মিলনের গানগুলিতে একটা অতীন্দ্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাই যেন কঠোর, সুদীর্ঘ বিরহ-তপস্যায় তাঁহার প্রিয়তমকে চিরদিনের জন্য অন্তর্লোকে লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন শান্ত, সমাহিত, চিদানন্দময়ী। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, লজ্জা, বাসনা, দ্বিধা, দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া স্থিতধী অবস্থাপ্রাপ্ত। লক্ষ লক্ষ কোকিলই ডাকুক, উদিত হউক লক্ষ চন্দ্র। লক্ষ ফুল বাণে পরিণত হউক পঞ্চ ফুলশর, মন্দ মন্দ বহুক মলয় পবন, তাঁহার তাহাতে আজ কিছুই যায় আসে না।

"সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ লাখ উদয় কর-চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবণ বহু মন্দা।"

আজিকে তাঁহার চিত্ত প্রেমনিবিষ্ট। আজি তাঁহার প্রিয়তমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

"সুনু রসিয়া। আর নই বজাউ বিপিন বসিয়া॥
চরণারবিন্দ তাহি। সদা রহিব বনি দসিয়া॥"

শুন রসিক, বিপিনে আর বাঁশী বাজাইও না। বার বার তোমার চরণারবিন্দ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা দাসী হইয়া থাকিব।

আজ তিনি সোল্লাসে বলেন,—

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মন্দিরে মোর॥"

তাঁহার আর কোনো অভাব অভিযোগ নাই।

"যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল হরি পরসাদ॥"

পুনর্মিলনে গোবিন্দদাসের শ্রীরাধিকারও সকল জ্বালা যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

"যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥"

তখন শরৎকাল। চাঁদিনী রাতি। ফুল্ল জ্যোৎস্না। নিকুঞ্জভরা প্রস্ফুটিত কুসুমে।

"শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ।
ফুল্ল মল্লী মালতী যূথী মত্ত মধুপ ভোরণী॥"

এমন শারদ সৌন্দর্য্যভরা এক উৎসব নিশীথে গোবিন্দদাসের শ্রীরাই পাইলেন শ্রীমাধবকে চিরতরে। যুগল মিলন হইল। সে কি অপরূপ!

"ও নবজলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ ॥
ও বর মরকতঠান। ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥
রাধামাধব মেলি। মূরতি মদন রসকেলি ॥
ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যুথী রসাল ॥
ও নব পদুমিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥
ও মুখ চাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুব্ধ চকোর ॥
অরুণ নিয়ড়ে পুনচন্দ। গোবিন্দদাস রহু ধন্দ ॥"

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস পুনর্মিলনে রাইয়ের সকল দুঃখ, শঙ্কা, আশা আকাঙক্ষার পরিসমাপ্তি করিয়া দিয়াছেন। চরম তৃপ্তির মগ্নতা আনিয়া দিয়াছেন তাঁহার অন্তরে।

কিন্তু জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস তাঁহাদের রাইয়ের অন্তরে জাগাইয়া রাখিয়াছেন অনির্ব্বাণ একটা বিচ্ছেদ শঙ্কা।

প্রিয় মিলনের পরও জ্ঞানদাসের রাইয়ের প্রাণে একটা ভয়।

"শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ
আর না দিব ছাড়িয়া ॥"
"খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।"
"আর না করিব আঁখির আড়।"

চণ্ডীদাসের রাই বলেন,—

"সই অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি ॥"

তিনি শ্যাম বঁধুয়াকে একেবারে হিয়ার মাঝারে রাখিতে চাহেন।

"অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব ॥"

জ্ঞানদাসের রাইও একই ভাবে বলেন,—

"বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব ॥"

ইঁহাদের রাইয়ের অসীম প্রেমই জাগাইয়া রাখিয়াছে—এই ভয়, দ্বিধা, উদ্বেগ, অতৃপ্তি।

চণ্ডীদাসের রাই বলেন—

"তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।"

হারানোর শঙ্কা তাঁহার চিত্তে আনে বিবশ বিহ্বলতা। মিলনেও বিচ্ছেদভীতি।

"দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

মিলনেও হারানোর শঙ্কা তাঁহার মনে স্বস্তি দেয় না। একটা অতৃপ্তি, একটা অশান্তি প্রাণে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকে।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পুনর্মিলনের গানগুলি যেন একখানি বিরহ ব্যথারই ছবি।

বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের রাধার কৃষ্ণ মিলন রসও যেন প্রগাঢ় হইয়া বিরহ রসের মতই হইয়া উঠিয়াছে। মিলনের মধ্যেও এক রহস্যময় বিবশ-ব্যাকুলতা ছাইয়া আছে।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা চাহেন এমন মিলন—যাহাতে দুটি জীবন এক হইয়া যায়। তিনি চাহেন—দুইটি জীবনকে একটি জীবনের পূর্ণ অনুভূতিরূপে। দেহতে রচে ব্যবধান, তাই দেহটিকে সরাইয়া ফেলিয়া তিনি চাহেন প্রাণে প্রাণে মিলন।

যুগ যুগ ধরিয়া চণ্ডীদাসের রাইয়ের ইহাই সাধনা। সম্পূর্ণ সিদ্ধি না হওয়া অবধি এই দ্বিধা, এই উদ্বেগ এই শঙ্কা।

জীবাত্মা পরমাত্মাকে রূপরসশব্দগন্ধ স্পর্শের নিবিড় পরিবেষ্টনীতে আনিয়া উপভোগ করিতে চাহে। অসীমকে সীমার বন্ধনে আনিয়া উপলব্ধি করিতে চাহে, প্রেম মিলনে। অরূপকে রূপের মাঝে ধরিয়া রসঘনপ্রকাশে পাইতে চাহে। পরমাত্মাও জীবাত্মার সঙ্গসুখপিয়াসী জীবাত্মার প্রেম তিনিও কামনা করেন। জীবাত্মার নিবিড় বাহুবন্ধনে ধরা দিতে চাহেন। নহিলে তিনি যে একাকী, নিঃসঙ্গ।

তাই চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাইকে বলেন,—

"ভজন সাধন করে যেই জন তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ তুমি রসময় নিধি।।"
"রসের সাগরে ডুবায়ে আমারে অমর করহ তুমি।"
"রাধে ভিন্ না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইনু আমি।।"

পরমাত্মাও যে জীবাত্মার প্রেমের কাঙাল।

কৃষ্ণ বলেন,—

"রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি।।"

জ্ঞানদাসের কৃষ্ণও এই রাধাপ্রেমে আত্মহারা হইয়া বলেন,—

"সুন্দরি আমারে বলিছ কি?
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি।।
থির নহে মন সদা উচাটন সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশদিশ গণে তোমারে দেখিতে পাই।।
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া গিরিনদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে সদাই জাগয়ে মনে।।"

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা রাধাময় সব দেখি।
নয়নেতে রাধা গমনেও রাধা রাধাময় হোল আঁখি।।"

ভাবের পিয়াসী কৃষ্ণ নানাভাবে রাইয়ের সহিত ভাবের মিলন চাহিয়াছেন। নানা ছলে রাইয়ের অনুরাগ উদ্দীপন করিয়াছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পরের এই মিলন কামনার বাণীরূপই পদাবলীকাব্যের মিলন ও পুনর্মিলন চিত্র। এই মধুর নিষ্কাম ভগবৎ প্রেম মিলনের যে মহানন্দ—তাহাই "রাস।" পুরুষ ও তাহার হ্লাদিনী প্রকৃতির মিলন লীলা। ব্রজের কৃষ্ণ ও রাধার লীলামধ্যে এই বাণীই পরিচ্ছিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ চায়।—প্রেমের জন্য। ব্রজের কৃষ্ণরূপ ও রাধা রূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে, সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

শ্রীরাধাশ্যামের এই মিলন লীলার শেষ পরিণতি—রাইয়ের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে। প্রিয়তমের চরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনে ও স্বীয় বিস্মৃতিতে। রস-সাধকের ইহাই পরমকাম্য, চরম সাধনা। এই সাধনায় সাধক তাহার পরম কাম্যকে, পরম ইষ্টকে লাভ করে। নিজকে ভুলিয়া রাই ভাব-সম্মিলনে কৃষ্ণে যুক্তা হইলেন।

বৈষ্ণব কবিকুলের মিলন ও পুনর্মিলনের গানগুলি তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রাণের অনুভূতি, ও রাগলীলা মাধুরীর মর্ম্ম উপলব্ধির উপর অধিষ্ঠিত বলিয়াই তাহা এত জীবন্ত, উজ্জ্বল ও রসোচ্ছল।

তাঁহাদের হৃদয় সরোবরে রাগসাধনায়, যে শতদল একদা বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই দ্বারা তাঁহারা চিরসুন্দরের পূজা করিয়া গিয়াছেন। স্বামী-প্রেমকে শ্যামসুন্দরের প্রেমে,—কান্ত প্রেমকে তাঁহারা রাধাকান্তপ্রেমে পরিবর্ত্তিত,

পরিবর্দ্ধিত করিয়া সসীমে অসীমে যে মিলনলীলা সম্ভব তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার, অসীমের সহিত সীমার, অনিত্যের সহিত নিত্যের চির আকাঙ্ক্ষিত মিলনের আদর্শ চিত্র রূপবান হইয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে তাহাদের মিলন ও পুনর্মিলনের গানে। রবীন্দ্রনাথ এই মিলন চিত্রপাঠে মুগ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,—

> "সত্য করে বল মোরে হে বৈষ্ণব কবি, কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহতাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে ? বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে ?
> কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহু ডোরে আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে।
> রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
> চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার আঁখি হতে ?

একদা মহাভাব বৃন্দাবনলীলায় রূপের মাঝারে অঙ্গ লইয়া রূপায়িত হইয়াছিল, এবং মহাপ্রেম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন এই লীলায় অরূপ মহাভাব ও মহাপ্রেমকে আস্বাদ করিয়া লীলান্তে রাধাকৃষ্ণের দুই পৃথক সত্তা একাত্মক হইয়া যান—, তখন মহাভাব ও মহাপ্রেম আবার ছাড়া পান রূপের বন্ধন হইতে। বৃন্দাবনের এই রূপলীলার ভাবে ফিরিয়া যাওয়াই ভাবসম্মেলন। রাধার এই ভাবসম্মেলন কৃষ্ণের সহিত রূপলোকে নয়, মনোলোকে ভাবলোকে। সেখানেই রাইয়ের কৃষ্ণসহ নিত্য মিলন। দ্বৈতভাব দূর হইয়া অদ্বৈতভাব সম্মেলন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য

বিদ্যাপতির শ্রীরাধা।

বিদ্যাপতির শ্রীরাধার কৈশোরচিত্র পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে উদিত হয়,—একি কবিতা পড়ি, না গান শুনি, না ছবি দেখি!

কবি বিশ্বসৌন্দর্য্য আঁকিয়া যান, তাহাতে কিশোরী মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতে থাকে, না কিশোরীর কথা বলিতে গিয়া বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল মাধুর্য্যের সঙ্গীত শোনান।

গান, ছবি, কাব্য একসাথে এই লাবণ্যময়ী কিশোরীকে অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত করিয়া তোলে,—না এই কিশোরীই বিশ্বপ্রকৃতির সকল সুষমা সকল মধুরিমাকে ধীরে ধীরে রূপায়িত করে।

একটি গরবিনী, স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের কুঁড়ি যদি আঁকিতে পারেন,—তাহাতে অঙ্গলাবণ্য ও বর্ণচ্ছটা, মাধুর্য্য ও সৌরভের গৌরব দিতে পারেন;—হাস্য, লাস্য, ।বলাস ও কৌতুকের রেখার টান দেন;—যদি গতিভঙ্গী, চাহনি, ছলনা; আশা, লজ্জা, ভয়; উদ্বেগ ও আকুলতার রঙ মেশান;—দেখিতে পাইবেন বিদ্যাপতির কিশোরী রাধার মুখখানি উঁকি দিতেছে তাহার মাঝে।

দেখিবেন, আধ গোপন, আধ প্রকাশ ভাবের কুঁড়ি ফুটি ফুটি করিতেছে সে মুখে। কিশোরী-কোরকটি যেন স্বল্পে স্বল্পে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। ঢল ঢল সে রূপ লাবণ্য। প্রাণের ফোটার আবেগে কিছু চঞ্চলতা দেখা দিতেছে।

"অতিথির নয়ান অথির কছু ভেল।"

কিঞ্চিৎ অধীরতা,—

"ঘেনে ঘেনে নয়ন কোণ অনুসরই।
ঘেনে ঘেনে বসনধুলি তনু ভরই॥"

খানিকটা চমকিত চলন, খানিকটা মৃদুগতি,—

"চৌঙকি চলয়ে ঘেনে ঘেনে চলু মন্দ।"

কিশোরী কুঁড়িটির দেহে শ্যাম-ভ্রমরকে দেখিয়া একটা পুলক চঞ্চল কম্পন-হিল্লোল খেলিয়া যাইতেছে। যেন একটু আকুলতা, একটু আন্দোলন, একটু কামনার সৃষ্টি হয় মনে। তবে সে নিজেকে আজিও জানে নাই।—অপরকে

চিনিতে শিখে নাই। জানি জানি চিনি চিনি র প্রচেষ্টা। কিন্তু কম্পিত শঙ্কিত ভাব।

অতি কৌতূহলে এক একবার সাহস সঞ্চয় করিয়া, অতি সন্তর্পণ সাবধনতায় চাঁপার কলির মত অঙ্গুলি দিয়া প্রেমের তারে ঝঙ্কার তুলিতে গিয়া শঙ্কিত-বিহ্বল হইয়া পলায়নপরা।

ক্রমে সে কুঁড়ি অর্দ্ধস্ফুট হইয়া উঠিল।

"শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন লেল॥"

এখনও সকলি রহস্যপূর্ণ। নিজের সম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে সে সচেতন নহে। লজ্জা, শঙ্কা, সংশয় কখন আপনাকে গোপন, কখন বা প্রকাশ করিয়া ফেলে।—

"কবহুঁ বাঁধয়ে কচ কবহুঁ উঘারি॥"

দিন যায়। অর্দ্ধস্ফুট সে কুঁড়ি এইবার পাঁপড়ি মেলিয়া ধরিল। প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাঁপড়ির নিখুঁত সামঞ্জস্য সাজাইয়া রাখিয়াছিল, সেই সামঞ্জস্য লইয়া পাঁপড়িগুলি গা এলাইয়া দিল। সদ্য বিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে—

"চরণ চপলগতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরয পদতল যাব॥"
"উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ।"

এখন হৃদয়ে নবীন বাসনা সব সহস্র পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়। অথচ পথ, ঘাট, মাঠ, আকাশ, পৃথিবী—সম্পূর্ণ অপরিচিত। কৌতূহলে সে ঈষৎ উড়িয়া আবার তখনই ভয়ে, লজ্জায়, দ্বিধায় জড়োসড়ো হইয়া ফিরিয়া আসে আপন কুলায়।

এই যে দ্বন্দ্বের খেলা বিদ্যাপতির কিশোরী রাইয়ের মনের, ইহাতে বিশ্বের সকল কিশোর হৃদয়ের চিত্র অনবদ্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্য্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি, কেবলি নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং

বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য্য যে কত ছন্দে, কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে,—বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।"

ইহার পর এই চঞ্চলা মেয়েটি ক্রমবিকাশের পথে আগাইয়া চলিল দিনে দিনে।—লীলায়িত এলায়িত ভঙ্গিমায়, নৃত্যছন্দে।

বিশ্বপ্রকৃতি তাহাকে চলার পথে নিঃশেষে নিজ সৌন্দর্য্যসুষমা ঢালিয়া দিয়া একদা "তিলোত্তমা" গড়িয়া তুলিল।

এখন রাই রূপ লাবণ্যে পূর্ণবিকশিত তরুণী। লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, দ্বিধা, দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া প্রিয়তমের উদ্দেশে তাঁহার অভিসারগমন।—বর্ষার এক ঘোরানিশীথে।

"ভীমভুজঙ্গমসরণা। কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা।।
গগন সঘন মহীপঙ্কা। বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা।।
দশদিশ ঘন আন্ধিয়ারা। চলইতে খলই লখই নহি পারা।।"

এখনও কিছু যেন ভয়, কিছু লজ্জা, কিছু সঙ্কোচ মনের মাঝে ঘুরিয়া ফিরে। দুরু দুরু করে হিয়া।

"অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই ঝাঁপই নীলনিচোল।
কত কত মনহি মনোরথ উপজত মনোসিন্ধু মনহি হিলোল।।"

অভিসারপথের অভিযাত্রিনী রাইয়ের হৃদয়ের এই স্পন্দন হিল্লোল প্রত্যেক তরুণ তরুণীর হৃদয়ের স্পন্দনকে যেন আঁকিয়া ধরিয়াছে।

মানে—এই তিলোত্তমা তাহার অশ্রুসজল নয়ন দুইটি ও নৈরাশ্যম্লান, কাতর অথচ দৃপ্ত-মহিমময়ী মুখখানি লইয়া এক দিন আমাদের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থিত হইলেন যে সে চিত্র কখন মন হইতে মুছিবার নয়।

"অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহ শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি।।
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ।।
নীরস অরুণ কমল বর নয়নী।
নয়ন লোরে বহি যাওত ধরণী।।"

তারপরে মিলনে—একদা তিনি রসমহোৎসবে প্রমত্তা হইলেন। উল্লাস-রসের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া রাগলীলায় আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন। আজি আর মনে লাজ, ভয়, সঙ্কোচ, দ্বিধা, দ্বন্দ্বের,—বালাই নাই, কোনো বাধাই নাই।

আজ তাঁহার—

"পুলকে পূরল তনু হৃদয়ে হুলাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।।"

তিনি উচ্ছ্বাসে বলেন—

"কি পুছসি হে সখি কানুগুণ নেহা।
একহি পরাণ বিহি গঢ়ল ভিনদেহা॥

কিন্তু স্থূল দেহ রাগলীলা ছাড়াইয়া আজিও তিনি অতীন্দ্রিয়লোকে পেঁছাইতে পারেন নাই। হৃদয় সমুদ্র মন্থনের অমৃত পরিবেশন করিতে পারেন নাই। অন্তরের অন্তর্দেশের গূঢ়বার্ত্তা শুনাইতে পারেন নাই।

তাঁহাকে আরও পথ চলিতে হইবে ক্রমবিকাশের। তিনি অগ্রসর হইলেন। শেষে বিরহের অশ্রুজলে দৈহিক কামনার সকল মালিন্য বিধৌত করিয়া দিয়া, নিরাবরণ, নিরাভরণ, ভাবোচ্ছ্বাসের গূঢ়গহন রসের সৃষ্টি করিলেন।

তিনি আজ কাঁদিয়া বলেন,—

"শূন ভেল মন্দির, শূঁন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥"
"পিয়া বিন পাঁজর ঝাঁঝর ভেল।"
"যৌবন জনম বিফল ভেল।"

তাঁহার আজ সকলি গিয়াছে। নাই পূর্ব্বের সেই গরবিনী তিলোত্তমা মূর্ত্তি। নাই সে মুখর বাক্যচ্ছটা।

এমন কি তাঁহার—"নয়ানক নিদ্ গেও, বয়ানক হাস।" তিনি বিশ্ব-সুষমা ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু লইয়াছিলেন, সকলকে তাহা ফিরাইয়া দিয়া আজ নিঃস্ব, রিক্ত।

"শরদক শশধর মুখরুচি সোঁপলক, হরিণক লোচনলীলা।
কেশ পাশ লয়ে চমরীকে সোঁপল, পাত্র মনোভব শীলা॥
দশনদশা দ ড়িবকে সোঁপলক, বন্ধুরে অধর রুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী সোঁপলক, কাজর সনি সখী ভেলি॥"

এখন তিনি সর্ব্বত্যাগিনী। নৈসর্গিক প্রেমের পূজারিণী। দেহ ছাড়াইয়া, বিলাস, সম্ভোগ, রাগালসতায় অনাসক্তি দেখাইয়া, সকল পার্থিব বস্তুতে ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য আনিয়া তিনি মহাভাবলোকে অধিষ্ঠিতা। হৃদয়ের গূঢ়, গভীর বার্ত্তা শুনাইলেন বিশ্ববাসীকে। তাঁহার অন্তরের সে সুর চিরন্তন প্রেমলোক স্পর্শ করিয়া, দেশকালপাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া চিরকালের তরে শাশ্বত হইয়া রহিল।

বিরহ-তপস্যার ফলে অবশেষে তিনি মহাভাবমগ্নতায় চির সুন্দরের সহিত দেহাতীত সম্মিলন লাভ করিলেন। তাঁহার আজ সকল অবিদ্যার নাশ হইয়াছে। চিরসুন্দরের সহিত এখন একাঙ্গীভাব। প্রিয়তমকে তিনি চিরদিনের জন্য অন্তর্লোকে লাভ করিয়াছেন।

তিনি আজ সোল্লাসে বলেন—

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।।"

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ দশদিশ ভেল নিরদন্দা।।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সব সন্দেহা।।"

চরম পরম পরিতৃপ্তি। প্রিয়তমে তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এইরূপে তিনি নিজকে ভুলিয়া ইষ্ট-দেবতার সহিত ভাব-সম্মিলনে যুক্তা হইলেন। জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিলেন।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার ন্যায় এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করেন নাই। রাইয়ের কৈশোরচিত্র চণ্ডীদাসে দেখি না। তাঁহার কিশোরী রাধা কোথায় কোন্ নিভৃতে তাঁহার শৈশব কাটাইয়াছেন তাহা কবিই জানেন।

তাঁহার রাধা প্রথমদর্শনেই নবযৌবনা। তখন হইতেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমের মলয়হিল্লোলে কম্প্রহৃদয়া চিরতরুণী এবং শেষ পর্য্যন্ত একই আত্মভোলা প্রেমতন্ময়তার ভাব বিদ্যমান।

একটি বিকচ কমলের পানে চান।—শ্বেতকমল। যাঁহার চণ্ডীদাস পড়া আছে শ্রদ্ধার সহিত, তাঁহার মনে পড়িবে ইঁহার শ্রীরাধাকে। —শুচি শুভ্র, পূত নম্র, মাধুর্য্যময়ী একটি শতদল। ধূপ, ধুনা, অগুরু, চন্দনের সুরভিসিক্ত হাওয়ায় পরিবেষ্টিত।

কিন্তু এই কমল হাস্যলাস্যময়ী,—না ম্লান করুণমুখী ঠিক বোঝা যায় না। জানিয়াও যেন জানা যায় না, ধরিয়াও যেন ধরা যায় না। মনে হয় ইহার প্রতিটি পাপড়ি যেন সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা ধারায় সিঞ্চিত, অথচ অনুভূতির দ্বারাও স্পর্শ করা যায় না। এই কমলের প্রিয়মিলনেও যেন দুঃখ, সুখেও সংশয়।

"দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

একটা অনির্দ্দেশ্য বিবশ-ব্যাকুলতা।—একটা সকরুণ আর্ত্তি, চিরন্তন বিরহের শঙ্কা।

মনে হয় এই কমলের দলগুলি যেন প্রাকৃত দল নয়, দেহ দেহ নয়। রূপের লাবণ্যদ্যুতি ও মনের মাধুরীটুকু ছাড়া আর কিছুই নাই। যেন একটা নিরবলম্ব সৌন্দর্য্যের ভাবপ্রতিমা।—অথচ দৃষ্টি গোচর।—আনন্দেও বেদনা, সুখেও দুঃখ,

মিলনেও আশঙ্কা, দুঃখেও সুখ দুঃখাতীত ভাব, বেদনার মধ্যেও একটা কি জানি কিসের আবেশ ও তন্ময়তা বিদ্যমান।

যতদূর জানা যায়—এই রাইকমল অভিসারে বাহির হন নাই। বর্ষার দিনেও তিনি ধ্যাননিমগ্না।

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে যেমন যোগিনীপারা॥"

মানেও—তিনি এমনি নৈসর্গিক প্রেমবিহ্বলা যে তাঁহার মান অভিমানকে মনে হয় যেন আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তিনি বড় জোর বলেন—

"যাহার লাগিয়া যেজন মরয়ে সে তারে পাসরে কেনে?
"সকলি আমার দোষ হে বন্ধু সকলি আমার দোষ।
কাহারে করব রোষ॥"

মিলনে—তাঁহার সম্ভোগের বাসনা নাই। সম্ভোগতৃষ্ণাবিহীন। আছে শুধু মিলনানন্দের একটা অতিলৌকিক ভাবোচ্ছ্বাস। আত্মহারা তিনি বলেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণবঁধু হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়॥"

প্রিয়তমের পায়ে সুমধুর আত্মসমর্পণ!

বিরহেও—তিনি অবিচল, প্রেমবিভোরা। তিনি যোগিনীর পারা।

"নিজ কায়াপর রাখিয়া কপোল মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মেঘেরিধারা॥"

সর্ব্বক্ষণ শ্যামনাম জপরতা।—

"শ্যাম যন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা জপিতে জপিতে চায়।"

পরমভাগবতময়ী নারী।—

"যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।"

যেন নৈসর্গিক প্রেমসাধিকা এক হৃদয়ে অনুরাগ-বহ্নি জালাইয়া শ্যাম-সূর্য্যের পানে চাহিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্না।

তাঁহার কাছে এই শ্যামপ্রেমই সর্ব্বস্ব। চণ্ডীদাস এই প্রেমকে "পিরীতি" আখ্যা দিয়াছেন।

রাই বলেন—

> "পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি হৃদয়ে লাগল সে।
> পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে পিরীতি গড়ল কে ॥"
> "পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর না জানি আছিল কোথা।
> পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল পরাণ পুতলি যথা ॥"

পিরীতি এই তিনটি আখর রাইয়ের সর্ব্বস্ব, তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই পিরীতির সীমা পরিসীমা নাই। ইহা অনাদি, অনন্ত, অপরিমেয়।

এই পিরীতির জন্য তাঁহার অন্তর দিয়া যে আকুতি ও আর্ত্তি, পূর্ণের সহিত মিলনের যে তৃষ্ণা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নিখিল বিশ্ববাসীর অন্তরের চির জাগ্রত পিপাসারই (Eternal yearning) প্রতিধ্বনি। এই রাধা যেন যুগ যুগান্তরের, দেশ দেশান্তরের মানব হিয়ার অজানা অনন্তের জন্য চিরন্তন ব্যাকুলতার বাণীকে নিজ অন্তরে ধরিয়া রহিয়াছে। এই যে yearning ইহা চণ্ডীদাসের প্রত্যেক পদেই গভীরভাবে অনুস্যুত।

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাকে বিশ্বের "চির-বিরহিনী" নারী বলিয়াছেন।

তাঁহার আকুলতা, আর্ত্তি, বিরহবেদনা এতই গভীর যে তাহা লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ "সে কথা কহিবার নয়।"—শুধু অনুভব করিবার। বলিতে পারি না সে কোন্ স্বপ্ন লোক, কোন্ ভাবলোক, কোন্ মহামানবতার হৃদয় লোক,—যেখানে সকল গণ্ডী, দেশকালের সীমা পার করিয়া লইয়া যায় চণ্ডীদাসের এই চিরবিরহিণী নারীর আত্মহারা প্রেম। জগত সংসার অসার বলিয়া মনে হয়। চিরন্তন ধনের জন্য একটা অপূর্ব্ব তৃষ্ণায় প্রাণ যেন হাহাকার করিতে থাকে।

পুনর্মিলন বা ভাবসম্মিলনেও তাঁহার রাইয়ের বিরহ ব্যথার অবসান হয় নাই। তাঁহার কৃষ্ণমিলন রসও যেন প্রগাঢ় হইয়া বিরহরসের মতই হইয়া উঠিয়াছে। মিলনের মধ্যেও সেই রহস্যময় বিবশ-ব্যাকুলতা বর্ত্তমান।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতির কাব্য পাঠে দেখা যায় তাঁহার কাব্যধারা চিত্রের পর চিত্রে বিচিত্র তরঙ্গলীলায় ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহা যেমন উদ্বেল তেমনি প্রাণস্পর্শী। পূর্ব্বরাগ, মিলন, অভিসার, মান, বিরহ প্রভৃতির বাণীরূপ তিনি স্বতন্ত্রভাবে ক্রমশঃ অঙ্কিত করিয়া এক অখণ্ড সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

পদাবলীর চণ্ডীদাসে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যধারায় প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, ভাবসম্মিলন ও মিলনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গরাশি

এরূপভাবে ওতপ্রোত যে মান অভিমান, বিরহের বৈচিত্র্য বিদ্যাপতির মত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশস্থলেই রাইয়ের আত্মহারা ভাবটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যাপতির অপরূপ উপমা গৌরব, ছন্দের অতুলনীয় ঝঙ্কার, কলানৈপুণ্য, শব্দালঙ্কারের কারুচ্ছটা, মনোমোহন কবিত্ব চণ্ডীদাসে নাই।

চণ্ডীদাস সহজ ভাষার কবি। কিন্তু সে ভাষায় অন্তর্দেশের যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, আত্মবিস্মৃত ধ্যানমগ্নতার ভাব ফুটিয়াছে তাহা অতল স্পর্শ। সে ভাব-গভীরতা বিদ্যাপতিতে নাই।

বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার সলজ্জ চকিত চাহনিটুকু, হিয়ার দুরু দুরু স্পন্দন, গমনভঙ্গীর স্বচ্ছন্দ, উচ্ছ্বাস উল্লাসের রেশ, দুর্জ্জয় অভিমানের অবনমিত ভঙ্গিমা, মিলনের বিচিত্র আনন্দমধুর আবেশ, বিরহের নিদারুণ দহন জ্বালাটুকুও অপূর্ব্ব তুলিকাপাতে চলচ্চিত্রের মত চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পদে রস যেন উথলিয়া উঠে, উপচিয়া পড়ে। তাহার চিত্র, বর্ণ, রূপ, ভাব সব যেন মাধুর্য্যে মণ্ডিত। প্রেমের আবেগ আকুলতায় তাহা এমনি উচ্ছ্বাসময় যে উপমা, ছন্দ, শব্দ, ধ্বনি, অলঙ্কার কিছুই দেখিবার প্রয়োজন হয় না।

চণ্ডীদাসের পদগুলিতে বিদ্যাপতির মত রচনাচাতুর্য্য নাই, অলঙ্কারের শিঞ্জন নাই, অনুপ্রাসের লালিত্য নাই, চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় ও অতুলনীয় কল্পনায় তাহা অভিরঞ্জিত হইয়া উঠে নাই কিন্তু তাহা একেবারে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিয়া "প্রাণ আকুল" করিয়া দেয়।

বিদ্যাপতি—সুখের কবি।

চণ্ডীদাস—সুখ দুঃখাতীত কবি।

বিদ্যাপতির শ্রীরাধা রক্ত-গোলাপের উপর অধিষ্ঠিতা রূপলক্ষ্মী। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা শ্বেতশতদলে আসীনা রস-সরস্বতী।

বিদ্যাপতির বিচিত্র চিত্রশালায় মন বিহার, বিলাস, বিভ্রম, লাস্য, হাস্য, মদরাগ ও অভিসারের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

চণ্ডীদাসের কাব্যকুঞ্জে মন আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ, হাসি, অশ্রু—এসবের অতীত একটা অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে প্রয়াণ করে।

বিদ্যাপতির কাব্যশরীরের লাবণ্য অপূর্ব্ব।—তাহার তুলনা নাই। অন্ত-সৌন্দর্য্যের রূপসৃষ্টিতে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কবি জগতেই বিরল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনায় চণ্ডীদাসের ভাবের মহত্ব, মিলন ও বিরহে আবেগের গভীরতা, অনুরাগের অসীমতা মানবমনকে এক অতি উচ্চস্তরে লইয়া যায়। তাঁহার কাব্যের সুরতরঙ্গিনী ধারায় ভাবের অলকানন্দা মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মহিমার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার কুঞ্জকুটীর যেন প্রেমযোগীর সাধনার আশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির অতুলনীয় কবিত্ব, তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্ব-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ, তাঁহার মহাকবিসুলভ ভাব পরম্পরা, আমার্দের হৃদয় মনকে যেন সম্মোহিত করিয়া তোলে। তাঁহার রস-বৈচিত্র্য, কল্পনার বিস্তৃতি, শব্দকুশলতা মনে এক অপূর্ব্ব আবেশ আনিয়া দেয়।

সৌন্দর্য্যের কবি বিদ্যাপতি বিশ্বসৌন্দর্য্য হইতে তিল তিল করিয়া সুষমা সম্পদ সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র তুলির পরশে তাহাতে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া মানসী প্রতিমাকে শ্রীরাধায় রূপ দিয়াছেন।

তাঁহার রাই যেন বিশ্ব সৌন্দর্য্যের "তিলোত্তমা।"

মাধুর্য্যের কবি চণ্ডীদাস বিশ্বের সকল মধুরিমা, সকল রসসার আহরণ করিয়া যেন সরল, অনাড়ম্বর, সহজভঙ্গীতে আপন মনের অগাধ মাধুরী দিয়া তাঁহার রাই ধনিকে গড়িয়াছেন।

তাঁহার রাই যেন বিশ্ব মধুরিমার, রসমাধুর্য্যের "মহাশ্বেতা।"

যেখানে বিদ্যাপতি প্রেমের মর্ম্মর খচিত, অতুলনীয় তাজমহল গঠন করিয়াছেন সেখানে প্রেমের গগনস্পর্শী সুবর্ণ দেউলে প্রেমপূজারী চণ্ডীদাস জীবন-দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনরত। তাঁহার প্রেমমন্দিরের চূড়া মর জগতের ধূলামাটি ছাড়িয়া উর্দ্ধে স্বর্গভূমি স্পর্শ করিয়াছে।

উপসংহার।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, শুধু তাই বলি কেন সকল বৈষ্ণব কবির রচনাই মধুর রসের। কিন্তু এই মধুর রসের সাথে একটা কারুণ্যরস ধারা সংমিশ্রিত।— একটা গভীর বেদনার সুর।

বিদ্যাপতির কাব্যে কম, চণ্ডীদাসের কাব্যে বেশী।

এই কারুণ্য—মানব জীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, রিক্ততা, সসীমতা, অতৃপ্তি ও অস্বস্তির বেদনাজনিত কি?

পূর্ণকে অপূর্ণ, অসীমকে সসীম, নিত্যকে অনিত্য হৃদয়ে পাইয়াও যে ধরিয়া রাখিতে পারে না, মরজীবের এই যে অক্ষমতা, এই যে দৈন্য, তাহারই আক্ষেপ, ইঁহাদের কাব্যে এই কারুণ্য রসের সৃষ্টি করিয়াছে কি? এই কারুণ্য

কি মিলন বাধার কারুণ্য? যে কারুণ্যে—,তাঁহাদের রাই আক্ষেপ করিয়া বলেন—

"চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব গিরিনদী আঁতর ভেলা॥"

যাহার সহিত ব্যবধান হইবে বলিয়া বুকে বসন, চন্দন, হার পর্য্যন্ত রাখি নাই। আজ তাহার সহিত গিরিনদীর ব্যবধান হইয়া গেল। এত করিয়াও তিনি চিরসুন্দরকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। এই যে হাহাকার রাধা হৃদয়ের, এই যে অসহায়তা মরজীবের,—ইহাই কি সেই কারুণ্য? ইহারই সুর কি সমুদয় পদাবলী সাহিত্যে আমরা পাই না?

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্য অতি উচ্চস্তরের। মধুর রসের সহিত এই অতিলৌকিক কারুণ্যরস মিশিয়া থাকিয়া ইঁহাদের সাহিত্যিকে একটা বিশেষ মহত্ত্ব ও গৌরব দান করিয়াছে।

বৈষ্ণব কাব্যধারার উপসংহার

বৈকুণ্ঠের ভগবান যেমন সাধারণ মানবের নিকট রহস্যময়, অতীন্দ্রিয়, শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামসুন্দরও তেমনি সাধারণের নিকট রহস্যময়, এবং রাধা-কৃষ্ণলীলা ততোধিক রহস্যাবৃত। একমাত্র রসসাধক যাঁহারা, তাঁহারাই শুধু এই রহস্যজাল ভেদ করিতে সমর্থ।

বৈষ্ণব কবিকুল এই রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

কোন্ নিভৃতে, নির্জ্জনে নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত কোন্ শুভমুহূর্ত্তে মিলিত হইয়াছিলেন, শ্রীরাধার কিরূপভাবে মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, কবে কৃষ্ণ প্রিয়া রাধিকা কিরূপভাবে বিরহে ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ মিলনে তাঁহার কি সুখের উদয় হইল, কিরূপে রাই অভিসার পথে সকল বাধা জয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিলনে কৃষ্ণের কত সুখের উদয় হইল, এ সকলই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রভৃতি সাধক কবিগণ তাঁহাদের সাধন দ্বারা অনুভব করিয়া কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। এই কবিগণ নিজেরাই যেন এক একটি রাধিকা। রাধিকা শব্দের অর্থ আরাধিকা। তাঁহাদের মনই বৃন্দাবন, তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তি সাধনায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া লীলা করিয়াছেন তাঁহাদের সাথে।

সুতরাং রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণ লীলানুরূপ তাঁহাদের মনেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

তাই আজ তাঁহাদের প্রসাদে আমরা জানিতে পারি মধুর প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তিকা এই রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা। আর জানিতে পারি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ও নারদীয় পুরাণে। নতুবা সাধারণ মানুষের কাছে তাহা চিরদিন অজ্ঞাতই থাকিত। জানিত শুধু সাধকেরা, সর্ব্বজ্ঞেরা।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জীবনে এই লীলা প্রকট হয় এবং তখন হইতে প্রেম-ধর্ম্মের বাণী মানব সমাজে প্রচারিত হয়। বৃন্দাবনে যে কালে এই লীলা প্রকট হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, সে কালের লোকেরাও ইহার কিছুই জানে নাই। গোপীগণের মাতাপিতা স্বামীপুত্র স্বজনাদিও এ রহস্য জানিতেন না। অন্যে পরে কা কথা।

প্রাকৃত জগতের লোকেরা এই মধুর প্রেমধর্ম্মের অপপ্রয়োগ করিবে বলিয়াই বোধ করি, শ্যামসুন্দর এই লীলা করেন গোপনে, অতি গোপনে।

যাঁহারা অধিকারী, যাঁহারা সন্ধানী, তাঁহারাই শুধু ইহার সন্ধান পাইলেন। অধিকারী ভক্তগণ, সাধক কবিগণ সেই পথ অনুসরণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমার্থ লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া গেলেন মানবের জন্য রাগাত্মিক সাধন প্রণালী, আর সাধক কবিবৃন্দ দিয়া গেলেন জগৎকে তাঁহাদের অপূর্ব্ব, অনবদ্য কাব্য, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার পদাবলী।

ভারতবরেণ্য তত্ত্ববিদ্যায়। জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গের আলোচনায় সে জগতকে বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভক্তিমার্গ বা প্রেমমার্গ তাহাকে আরও বড় করিয়াছে। তাহার শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাহার দর্শনে নয়, প্রেমভক্তিক্ষেত্রের কর্ষণেও। এই প্রেমভক্তির চর্চ্চা পৃথিবীর কুত্রাপি এরূপ হয় নাই।

আর এই "ঐকান্তিকী ভক্তির" সাধনা বৈষ্ণবসাধকগণ যেরূপ করিয়াছেন, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। বৈষ্ণব কবিকুল ইহার চরম করিয়া গিয়াছেন।

এই ভক্ত কবিকুলের হৃদয় রাধা শ্যামের বাঁশরীর সুর শুনিবার জন্য সদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। যেই সেই সুললিত স্বরলহরী কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই মুহূর্ত্তে সে জগৎ সংসারের সকল মায়াবন্ধন কাটিয়া যাইত, তাহার প্রিয়তমের উদ্দেশে। তাঁহাদের হৃদয় রাধার এই যে আকুলতা, এই যে আকুতি, এই যে ব্যাকুল মিলন আকাঙ্ক্ষা, এই যে একাগ্র ভাগবত প্রেম, প্রেমভক্তিমার্গের ইহাই চরম-আদর্শ।

এই যে yearning for Eternity ইহা বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের পদে গভীরভাবে অনুস্যূত। তাঁহার রাধার এই যে কৃষ্ণমিলন তৃষ্ণা, ইহা যেন মানুষে মানুষে সম্ভব নয়। ভক্তের ভগবানকে পাইবার একাগ্র সাধনা ছাড়া যেন ইহা অন্য কিছুই নয়। তাই কাব্য হিসাবে কেবল বিচার করিতে গেলেও তাঁহার পদগুলিকে Romantic না বলিয়া Mystic Lyric Poetryই বলিতে হয়।

জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ, এই ভক্তগণের নিকট তুচ্ছ, তাঁহাদের প্রেমধর্ম্ম সাধনার বরং পরিপন্থী। মনের অভাব নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান, আর দেহের অভাব নিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম। জীবনে যাঁহারা কোনো অভাবই অনুভব করেন না, তাঁহাদের জ্ঞানমার্গ বা কর্ম্মমার্গের প্রয়োজন কি?

ইহার ফল একদিক দিয়া মন্দও হইয়াছে। যাঁহারা এইসব কবি ও সাধকের মত উচ্চশ্রেণীর মানুষ নহেন, অথচ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব যাঁহাদের উপর পড়ি-

য়াছে, এবং বৈষ্ণব পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাঁহারা জীবন যাপন করিয়াছেন, কর্ম্ম ও জ্ঞানের চর্চ্চার অভাবে তাঁহারা নিশ্চেষ্ট নারীভাবাপন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রভাবে সমগ্র সমাজই তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার্য্য যে, এই উদার ধর্ম্মই মুসলমান আমলে হিন্দুগণকে প্রবল ধর্ম্মান্তর গ্রহণের বন্যা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

এইসব সাধক কবিগণ বলেন,—নদী যেমন ছুটিয়া যায় সমুদ্রের পানে আকুল আবেগে, কিন্তু কেন সে জানেনা, তথাপি ছুটিয়া যায়। ইহাই তাহার প্রাণধর্ম্ম। মানবের আত্মাও তেমনি ছুটিয়া যায় ব্যাকুল আগ্রহে পরমাত্মার দিকে কেন, সেকথা সেও জানে না,—ইহাই তাহারও প্রাণধর্ম্ম।

নদীর এই ছুটে চলা ও মানবাত্মার পরমাত্মার উদ্দেশে অভিযান যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। মানুষের ইহাই স্বভাবধর্ম্ম। তবে নানা জন্মের সংস্কারে সে আজ আচ্ছন্ন, তাই সে বিপথগামী। আত্মার এই সহজগতি আজ সে বুঝিতে চায় না, পারে না।

রসসাধকেরা বলেন—প্রেমধর্ম্মের সাধনায় মানুষের হৃদয়ে আবার সেই সহজ ভাব সর্ব্বসংস্কারের বন্ধন ছেদন করিয়া উজ্জীবিত হয়, নিজের স্বভাবগত ধর্ম্ম সজাগ হইয়া উঠে ও তখন শ্রীভগবানকে পাওয়া সহজ হইয়া যায়।

এই সত্য উপলব্ধি করানোর জন্যই শ্রীরাধার জীবনে লোকলাজ, গুরুজনের শাসন, কুলশীল, সতীধর্ম্ম ইত্যাদির সংস্কার বন্ধনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সহজ প্রেমই এই সকল সংস্কারের বাধা চরণে দলিত করিয়া অভিসারে ছুটিতে পারে।

সুতরাং মানুষের পক্ষে যাহা সহজ ও স্বভাবধর্ম্ম, তাহাকে জাগাইয়া তোলে যে পথ, তাহাই শ্রেষ্ঠপথ এবং সেই পথকেই তাঁহারা আখ্যা দিয়াছেন— "সহজিয়া রাগাত্মিকা প্রেমধর্ম্মের পথ।"

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, কবিবল্লভ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা সঙ্গীতে এই রাগাত্মিক প্রেমধর্ম্মকেই রূপ দিয়াছেন। প্রেমধর্ম্মের এই আদর্শই চিরদিন প্রেমধর্ম্ম পথের যাত্রীর পাথেয় সম্বল হইয়া থাকিবে।

ভক্তি বা প্রেমমার্গের কথা আমরা নারদীয় পঞ্চদশী ও ভাগবতে পাই। সেখানে ভগবানের নিত্যলীলার কথা বর্ণিত আছে। তাহারই বাণীরূপ আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায়।

ভাগবতে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র প্রেমভক্তি। আমরা বৈষ্ণব কাব্যে চরম অনুশীলন দেখিতে পাই। তাঁহাদের রাই এই প্রেম ভক্তির জ্বলন্ত মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি একেবারে কৃষ্ণময়ী হইয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত

অভেদাত্মিকা। কৃষ্ণ-রাধার যে এই দেহভেদ তাহা শুধু এই মধুর রস-আস্বাদনের নিমিত্ত।

রাধাকৃষ্ণ যৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।

তাঁহাদের কাব্যে আমরা দেখি, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি কানু হইয়া বৃন্দাবনে বেণূ হস্তে এত রসময় রূপ ধরিয়াছেন।

দুঃখানলে মায়াজল ভস্মীভূত হইলে জীব ঈশ্বরমুখী হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবিগণ বিরহানলে তাঁহাদের রাধার সকল মলিনতা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বক্ষণের জপমালা হইয়াছেন। অনুক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তায় তিনি যেন কৃষ্ণের নিজস্ব প্রকৃতি পাইয়াছেন। প্রেমপথের পথিকের ইহাই মুক্তি। আনন্দময়ের আনন্দে বিভোর হইয়া, ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া "তত্বমসি" উপলব্ধি করা এবং মৃগমদ ও তাহার গন্ধ, অগ্নি ও তাহার জ্বালা যেমন অবিচ্ছেদ থাকিয়াও পৃথক, তেমনিভাবে ভগবৎ প্রেমরস আস্বাদন করা একই কথা।

চিত্ত যখন মধুর নিকাম ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়, তখনকার সেই চরম আনন্দ প্রাপ্তির লীলাকেই রসশাস্ত্রকারেরা রাসলীলা বলেন।

তাঁহাদের কাব্যের রাধার চিত্ত পুনর্মিলনে এই দেহাতীত মহাভাবে ভরপুর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত চির মিলন—নিত্য ভাব সম্মিলন, ইহাতে আমিত্বের বা দেহাত্মবাদের লেশমাত্র নাই। নিজ সুখ—কৃষ্ণসুখে পর্য্যাবসান—ইহাকেই বলে মহাপ্রেম।

বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র তত্বকে রূপ ও রসে মিলাইয়া পরিমূর্ত্তি দিয়াছে। এই স্বষ্টি রচনার চতুর্থ স্তরে যে শ্যাম ও পীত জ্যোতিধারার মিলন স্পন্দনজ্ঞান সাধকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই তাঁহারা রূপকভাবে রূপ ও রসের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ ও রাধার যুগল রূপ আখ্যা দিয়াছেন। তাই কৃষ্ণের বর্ণ শ্যাম ও রাধার বর্ণ পীত। এই পীত জ্যোতিধারাকেই উপনিষদ হৈমবতী "উমা" বলিয়াছে, বৈষ্ণব শাস্ত্র "হ্লাদিনী শক্তি" বলিয়াছে। শ্যাম জ্যোতিকে বেষ্টন করিয়া পীত-জ্যোতি চক্রাবর্ত্তবৎ প্রতিভাত হয়। শ্যামজ্যোতিকে ঘিরিয়া পীতজ্যোতির এই যে আবর্ত্তন ইহাই রাসচক্রের নর্ত্তন।

বৈষ্ণবশাস্ত্র এই পীতধারাকে "গোপী" ও শ্যাম জ্যোতির্ধারাকে "রাসেশ্বর" বলিয়াছে, এবং ইহাতে যে মহাধ্বনি উথিত হয় তাহাই শ্যামের "বংশীধ্বনি"। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই স্থানকেই "রাসমণ্ডল বা নিত্য বৃন্দাবন" বলিয়াছেন।

শাক্তরা ইহাকেই "সহস্রারস্থ মহাপদ্ম বলেন। এই স্থানই আনন্দ দেশ, ভক্তি-শাস্ত্র কথিত প্রেমময় ধাম—বেদ প্রতিপাদিত সপ্তব্যাহৃতির চতুর্থ ব্যাহৃতি-মহো-লোক।

ঋষিরা সৃষ্টি-রচনায় সাতটি স্তর পরিকল্পনা করিয়াছেন। মলিনমায়া, শুদ্ধমায়া, মুক্তদেশ, আনন্দদেশ, সত্যদেশ, চিন্ময় দেশ ও নিত্যদেশ। ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহোর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোক। ব্রহ্মাণ্ডের মত মানবশরীরেও এই স্তরভাগ বর্ত্তমান। সুতরাং আনন্দদেশ বা নিত্যবৃন্দাবন মানবের নিজের মধ্যেও অবস্থিত।

বৈষ্ণব সাধক কবিকুল এই মনোবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য-লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইতেন। এই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নাই—বৃন্দাবন মথুরা ভেদ নাই। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" রসশাস্ত্রকারের এই বাণীর এই অর্থেই সার্থকতা।

এই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ পুনর্মিলন বা ভাব-সম্মিলনের রসচিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন।

বিরহটা মায়ামাত্র। রসসৃষ্টির জন্য ও পরমতত্ত্বের একটা মানবিক বা লৌকিক ব্যাখ্যা (Interpretation) দেওয়ার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ এই মায়াকেই একটা সত্যরূপ দান করিয়াছেন।

আত্মসমর্পণের সহিত সর্ব্বস্ব বলিতে যাহা কিছু সকলই প্রিয়তমের চরণে নিবেদন।

কি দিব কি দিব মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার নাথ, আমি যে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব, কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর, তুমি তার নিধি॥
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধনজন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহে ধনি এই সবে সার॥

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম।"

এইখানেই ভক্তিপথের, প্রেমপথের পথিকের গন্তব্যস্থান, ইহাতেই তাহার পর্য্যবসান, ভক্তের ভগবানে আত্মসমর্পণ বা বিসর্জ্জন। শ্রীরামকৃষ্ণের সোজা ভাষায় "বকল্‌মা" দেওয়া।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা জগতে যে বীজ প্রেমধর্ম্মের বপন করিল, কালে তাহাই ক্রমবিকাশলাভ করিয়া একদা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইল।

প্রেমধর্ম্মের সুরধনী বহিয়া গেল। কত প্রেমিক মহাপুরুষ সেই পুণ্যসলিলে অবগাহন করিয়া ধন্য হইল।

আসিলেন প্রেমপূজারীর দল বৈষ্ণব কবিকুল। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, কবিবল্লভ, রায়শেখর--কতশত কবি।

তাঁহাদের প্রেমধর্ম্মকাব্যের উছল তরঙ্গ কূলে কূলে রস পরিবেশন করিয়া বাঙ্গলার মাটিকে শ্যামময় করিয়া তুলিল। প্রেম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া সেই নদীতে মহাবন্যা আনিয়া তাহাতে শুধু—"শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়" নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ প্লবমান।

সাধকগণ ও কবিগণ মানসবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের রসলীলা চাক্ষুষ দেখিলেন। সে মিলনলীলা আজিও চলিতেছে, নিত্যকাল ধরিয়া চলিবে। ইহাই নিত্য-লীলা। যাঁহাদের সাধনা আছে, যাঁহারা এই লীলা দর্শনের অধিকারী, আজিও তাঁহারাই ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দেখিতে পান। যাঁহাদের সাধনা নাই তাঁহারা দেখিতে পান না বলিয়া ইহা আজগুবি মনে করেন।

তাঁহাদের মতে বৃন্দাবনভূমি চিন্ময়। ভৌগোলিক বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে এমন একটি রসময়ী আবেষ্টনী সৃষ্টি হইয়া আছে যে, যে-কোনো ভক্ত সেখানে গিয়া এই লীলামাহাত্ম্য অনুধ্যান করিলেই এই চিন্ময় বৃন্দাবনের সন্ধান লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন যে, কত বৈষ্ণব সাধক তাঁহাদের দেহ-সমাধির পর আজিও বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

কেহ সখাভাবে, কেহ সখীভাবে আজিও আমাদের আলোচ্য কবিগণ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি মনোবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলার সহচররূপে বাস করিতেছেন।

তাঁহাদের কাব্যের মাধুর্য্য, তাঁহাদের কীর্ত্তন সঙ্গীতের অমর কলতান আজও মানবমনোবৃন্দাবন মুখরিত কারয়া রাখিয়াছে।

বেদান্তমতে সাধকের আত্মা জ্ঞানমার্গে বিবর্ত্ত লাভ করিয়া একেবারে নিজের সকল সত্তা হারাইয়া ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। আর তাঁহার কোনো পৃথক সত্তাই থাকে না।

বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন—প্রেমধর্ম্মপথের সাধকের আত্মা পৃথক থাকিয়া প্রগাঢ় আনন্দে কৃষ্ণময় হইয়াও কৃষ্ণ প্রেমরস আস্বাদন করে।

জ্ঞানপথিক নশ্বর জগৎকে মায়াময় মনে কারয়া সৃষ্টিকে বাদ দিয়া স্রষ্টাকে লাভ করিতে চান।

প্রেমপথিক বহির্জগৎকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় থাকিয়া বাহিরের জগৎকে ভুলিয়া যান। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দময়। সেই

আনন্দ হইতে তাঁহার অন্তরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদ্ভব হয়। তাহাতে প্রেমিকভক্তের মনে ক্রমে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে সেবা করিবার বাসনা জাগে। এই মধুর ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-সেবাই প্রেমসাধনার পূর্ণ পরিণতি।

আমাদের আলোচ্যমান কবিগণ এই মধুর ভাবেই কৃষ্ণসেবা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি শ্রীরাধাসঙ্গিনী গোপী।

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও অপরাপর বৈষ্ণব কবিগণ সাধারণ মানব জাতিকে এক চমৎকার মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা সমাজের সঙ্কীর্ণ অনুশাসনকে উপেক্ষা করিয়া, মানবের স্বরচিত নিয়মজালকে ছিন্ন করিয়া, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, অনুষ্ঠান না মানিয়া, জীবকে সহজ স্বভাবগতি দিয়া, ধর্ম্মজগতের সর্ব্বপ্রকারের জটিলতা, সহস্রবিধ আচার অনুষ্ঠান ও নানাপ্রকারের অযথা আত্মনিগ্রহ ও আত্মনিপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহারা কামনাবিহীন পবিত্র প্রেমসাধনায়, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে নরনারীর অবাধ মিলনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে পবিত্র মধুর প্রেমসাধনে বামদেবের ললাটাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হইয়া যায়, যে প্রেম ঈশ্বরমুখী, তাহার জন্য তাঁহারা কোনো বিধিনিষেধের বাধা মানেন নাই। তবে তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন—যে যদি মন—কাম, ক্রোধ, স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, বাসনা হইতে মুক্ত না হয়, ব্রজগোপীর প্রেম কখনই অনুকরণীয় নহে। অনুকরণ করিতে গেলে শুধু সমাজ-দ্রোহিতাই হইবে।

তাহারা মানব অন্তরের সকল বন্ধন, সকল দাসত্ব, সকল সংস্কারের মুক্তিদাতা। ভবিষ্যৎযাত্রীদের জন্য তাঁহারা প্রেমধর্ম্মপথ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহান্ উদার পথে যে প্রেমিক প্রেমিকা রাইয়ের মতই নিঃশঙ্কচিত্তে অভিসারে গমন করিতে পারিবেন, তিনিই চিরসুন্দরের সাক্ষাৎলাভ করিবেন।

তাঁহাদের পদাবলীর সঙ্গীতধারা চিরদিন সাধকভক্তের চক্ষে অশ্রুর উৎসধারা বহাইয়া, কবিহৃদয়ে ভাবের বন্যা ছুটাইয়া, গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে মূর্চ্ছনা তুলিয়া, অনুর্ব্বর মানবমনকে চিরসরস ও শ্যামময় করিয়া তুলিবে।

রূপরসশব্দগন্ধ স্পর্শের নিবিড় পারবেষ্টনে চিরসুন্দরের অরূপলীলা রূপবান হইয়া রসঘন প্রকাশলাভ করিয়াছে, পদাবলী কাব্যে।

বেদান্তের "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্" রূপবান হইয়া এইসব কবির কল্পনার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়াছে।

তাঁহাদের কাব্যে শ্যামসুন্দর, অনন্তলীলাময়ের চির সত্যোজ্জল শাশ্বত প্রতীকরূপে বিরাজমান। ইহাই সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের, পক্ষে সার্ব্বভৌম পরমসত্য।

পদাবলী সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে মাধুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব কোথাও মিশ্রিত করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যভাব আরোপ করিলে যে রসের সৃষ্টি হয় তাহা নিম্নশ্রেণীর। মধুর ভাবের ত কথাই নাই—সখ্য, বাৎসল্যভাব ও উচ্চতর রসবস্তু।

বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচনার লীলাবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে বিবিধ প্রকরণে ভাগ করিয়াছিলেন। যেমন—পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, মান, কলহান্তর, গোষ্ঠলীলা, দানলীলা, রাসলীলা, বিরহ, মাথুর ইত্যাদি। এইগুলির আবার উপবিভাগ আছে। এইগুলিতে রাধাকে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকা-রূপেও দেখা হইয়াছে। যেমন—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, কলহান্তরিকতা ইত্যাদি।

পদাবলী সাহিত্যে সখ্য, বাৎসল্য রসের পদ কিছু কিছু থাকিলেও, অধিকাংশ পদই মধুর রসের। এই পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাকে বা ঐশ্বর্য্যকে সম্পূর্ণ নিগূহিত করা হইয়াছে।

পদাবলীর মধুর রস আলঙ্কারিকদের শান্তরসেরই সহোদর। পদাবলী সাহিত্যে যে বংশীধ্বনির আকর্ষণীয়, কথা বার বার আছে—তাহা ব্রহ্মাণ্ড ভুলাইয়া দিতেছে, নিজের দেহকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত করাইতেছে—একি বস্তু যাহা প্রাণ, কুলশীল মানলজ্জা ভয় সমস্তই ভুলাইয়া দিতেছে,—এ কোন্ পদার্থ যাহা সকলই তুচ্ছ করিয়া দিতেছে এক কৃষ্ণপ্রেম, পীরিতি ছাড়া? ইহাই ত মহাবৈরাগ্যের নিষ্কামপ্রেম। পদাবলী সাহিত্যে এই শৃঙ্গার, করুণ, শান্ত রসের ব্যঞ্জনায় রাধার সর্ব্বস্ব সমপণ ও আত্মবিস্মরণকেই রূপ দিয়াছে।

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির কাব্যপাঠে আমরা দেখিতে পাই চিত্রাঙ্কনী বিদ্যায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এক একটি তুলিকাপাতে, অপূর্ব্ব বর্ণ-রাগে, অতুলনীয় উপমা অলঙ্কার-উৎপ্রেক্ষাদিপ্রয়োগে, তিনি অপরূপ চিত্র ফুটাইয়া তোলেন।

বয়ঃ সন্ধি—শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধি তিনি কেমন চিত্রিত করিয়াছেন!

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল।।

অর্থাৎ চক্ষে প্রথম কটাক্ষের সঞ্চার হইল।

অতিথির নয়ান অথির কছু ভেল।

সেই সঙ্গে মনও কিছু চঞ্চল হইল। তাহার ফলে

কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি।।

কবি 'পরিবৃত্তি' অলঙ্কার প্রয়োগে বলিয়াছেন চরণের চপল গতি নয়ন পাইল এবং লোচনের স্থিরতা চরণ-যুগল পাইল।

চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরয পদতলে যাব।।

প্রকট হাসি এখন গুপ্ত হইল, লজ্জা দেখা দিল ও হাসি মিষ্ট হইল।

উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ।

অস্থিরতা দেখা গেল।

খেনে খেনে নয়ন কোণে অনুসরই।
খেনে খেনে বসন ধূলি তনু ভরই।

কখন চমকিত চলন, কখন মৃদুগতি।

চৌঙকি চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ—চিত্রের পর চিত্রে কি সুন্দর তুলিকাপাতে কবি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ অঙ্কিত করিয়াছেন!

কৃষ্ণ বলিতেছেন—শ্রীরাধিকার রূপ দেখিলাম। ঘন-মসীমাখা অন্ধকার তাহার চিকুরজাল, তাহাতে পূর্ণিমার চন্দ্রসম তাহার আননে, পদ্মের মত চক্ষু দুইটি ফুটিয়া আছে। এইরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল কিরূপে?

চিকুর নিকর তমসম পুনু আনন পুণিম শশী।
নয়ন পঙ্কজ কে পাতিয়ায়াব একঠাম রহু বসি॥

কমল-মুখে অমৃত ঝরিতেছে, প্রবাল-পল্লবে (রক্তাধরে) কুন্দ-কুসুমের মত দন্তরাজি।

অমিয়ক লহরী বম অরবিন্দ।
বিদ্রুম পল্লব ফুলল কুন্দ॥

সুন্দর ধবল নয়ন কাজর-রঞ্জিত—যেন বিমল কমলে মধুপ মেলা।

কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনি বিমল কমল পর॥

কোমলমুখী ধনি হাসিয়া কথা কয়—যেন শরৎকালের পূর্ণিমার চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে।

মনুঙাবদনী ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয় বরিখ জনি শরদ পুণিম শশী॥

মাধব বলেন,—স্নান-সমপনান্তে দেখিয়াছি তাহাকে একদিন—কেশপাশ বাহিয়া জলধারা ঝরিতেছে—যেন মেঘমুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে।

চিকুর গলয় জলধারা। মেহ বরিস জনি মোতিম হারা॥

আর্দ্র কেশজাল মুখে চোখে তাহার—যেন মধুলুব্ধ ভ্রমর কমলকে ঘেরিয়া আছে।

অলকহি তিতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥

সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের

নির্নিখি নিবারি রহল দুহু নয়না।

তিনি চলিতে চাহেন, কিন্তু চরণ চলে না।

চলইতে চাহি চরণ নহি যাব।

কৃষ্ণ বলেন, তবু ভাল করিয়া দেখি নাই।

আধ বদন হেরি লোচন আধ।
দেখব কিয়ে অরু পুন ভেল সাধ॥

কিন্তু মেঘে বিদ্যুতের মত চকিতে নীলাঞ্চলে সে মুখশশী ঢাকিল।

মেঘ বিজুরি জইসে উগি নুকি গেল।

সানন্দ বদন তাহার, চঞ্চল নয়নযুগ—যেন নীলপদ্ম দিয়া কেহ চন্দ্রপূজা করিতেছে।

লোচন চপল বদন সানন্দ।
নীল নলিনীদলে পূজল চন্দ।।

অলক্ষ্যে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল সে—যেন রজনী জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল হইল।

অলখিতে হম হেরি বিহুসলি থোর।
জনি রজনী ভেল চাঁদ উজোর।।

লজ্জায় ধনি দুই হাত জোড়া করিয়া সুন্দর মুখখানি ঢাকিল—কাম কি চাঁপাফুল দিয়া চাঁদের পূজা করিল?

জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল যৈসে শারদ চন্দ।।

এত রূপ যাহার তাহাকে দেখিতে কাহার না সাধ যায়?

ততহি ধাওল দুহু লোচন রে যতহি গেলি বরনারী।

এইরূপে অপরূপ অলঙ্কার প্রয়োগে চিত্রের পর চিত্রে মোহন তুলিকাপাতে কবি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ অঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ—নায়কের অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা রাধার মানসপটেও সেইরূপ অনুরাগের অরুণ আভা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল। তাহার শোভন চিত্র কবির তুলিকায় চমৎকার আলিখিত হইয়াছে।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—কৃষ্ণকে দেখিলাম আর আঁখি ফিরাইতে পারিলাম না।

মোর মনমৃগ মরম বেধল বিষম বাণ বেয়াধে।

মধুমত্ত ভ্রমর কি উড়িতে পারে? শুধুই পক্ষ প্রসারণ করে।

মধুক মাতল উড়য় ন পারয় তই অও পসারয় পাখা।

কানুর কথা শুনিয়া আমার চিত্ত উন্মত্ত হইল, তাহাকে দেখিয়া আঁখিযুগ মুগ্ধ হইল—যেন চন্দ্রোদয়ে আত্মহারা চকোর বন্দী হইল।

শুনি চিত উমত দেখি আঁখি ভোর।
চাঁদ উদয় বন্দী রহল চকোর।।

সখি! তখন কে ভাবিয়াছিল রাধার হাসি হইবে আঁখিজল।

শ্রীরাধিকার প্রেমের চিত্তচাঞ্চল্যটুকু তাঁহার কথায় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে ভেল পরমাদ।।
তবধরি অবোধি মুগধ হম নারী।
কি কহি কি শুনি কুছু বুঝই ন পারি।।
শাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস্ ধস্ করয়ে পরাণ।।

এখন ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও ভোলা যায় না।

যত বিসরিয় তত বিসর ন যাই।

আমার এ হৈল কি? রাই দুঃখ করিয়া তাই বলিতেছেন।

কি কহব হে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরল তনু ভোর॥

সখি! আমার দুঃখের অন্ত নাই। বাঁশীর গরল নিশ্বাসে বুঝি মনঃপ্রাণ বিহ্বল হইল। মদন-দহনে তাঁহার মনঃপ্রাণ জ্বলিতেছে। তাই তিনি কামদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—মদন তুমিও কি এমনি করিয়া অবলাকে বধ করিবে? আমাকে কি মহাদেব-বলিয়া ভ্রম হইয়াছে? তাই মদনভস্মের প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছ?

কতয়ে মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারি॥

কন্দর্প, তুমি যে বিষম ভুল করিতেছ। চন্দনরেণুকে বিভূতি ভূষণ, পট্ট-বস্ত্রকে বাঘছাল, বেণীকে জটাজাল, কুসুমের মালাকে সুরতরঙ্গিণী, চন্দনের ফোঁটাকে ইন্দুলেখা, সিন্দূরবিন্দুকে ললাট-নয়ন কেলিকমলকে নর-কপাল মৃগমদকে কালকূট, মুক্তামালাকে ফণী ভ্রম করিতেছ।

নহ নহ জটা ইহ বেণীবিভঙ্গ।
মালতী মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি কমল ফুল না হয়ে কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এহেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ-পঙ্ক॥

ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারের সাহায্যে এখানে কি সুন্দর কবিত্বই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! এইরূপে উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল।

দূতী-প্রেরণ—মাধবের দূতী আসিয়া বলিল,—রাই দুঃখ করিও না, কানাইও তোমার রূপগুণে মুগ্ধ। পৃথিবীর সকলে কানু-কানু করিয়া ঝরিয়া মরে।

সব জন কানু কানু করি ঝুরয়।

আর সে কানাই কিনা--

'রাই রাই কয় তনু মন খোয়' । 'তো বিনু উনমত কান' । 'সে তুয়া ভাবে বিভোর' ।

সে তোমার নাম করিতে প্রেমে বিহ্বল হয়—

করইতে নাম পেমে ভই ভোর।

সে তোমাতে অনুরত—

তোহে অনুরত ভেল শামরচন্দ।

বার বার করিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, এক কথাই কতবার বলিতে হয় ।

পুনু পুছ পুনু পুছ মোর মুখ হেরি।
কহিলিও কহিনী কহবি কত বেরি।।

শয়নে স্বপনে হরির আর কোন চিন্তা নাই।

তোরি এ চিন্তা তোরি এ নাম।
তোরি কহিনী কহয়ে সবঠাম।।

তাহার এখন এমন দশা হইয়াছে। অধিক কি বলিব—? যে নয়নভঙ্গী অনঙ্গও সহ্য করিতে অক্ষম, সেই নয়নে জলধারা, যে অধরে সদাই মধুময় হাসি, তাহা আজ দীর্ঘশ্বাসে মলিন।

যোই নয়নভঙ্গি ন সহ অনঙ্গ।
সোই নয়নে অব লোর তরঙ্গ।।
যোই অধর সদা মধুরিমহাস।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘনিশাস।।

তোমার দর্শন না পাইলে বোধ করি তাহার পরাণ বাহির হইবে।

'রাই দরশ বিনু নিকসে পরাণ।'
'তুয় দরশন বিনু তিলাও ন জীবই।।'

তোমার বিরহ-ভুজঙ্গ তাহাকে দংশন করিল—সে কি তোমার প্রেমামৃত ছাড়া আর বাঁচিবে ?

মদন ভুজঙ্গমে দংশল কান।
বিনহি অমিয়রস কি করব আন।।

আর তাহা ছাড়া যদি প্রেম করিতেই হয় ত' সুপুরুষের সঙ্গে করাই ত ভাল ।

সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়।
দিনে দিনে চান্দ কলা সম বাঢ়।।

দূতী আরও বলেন—

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি যব সুপুরুখ জানি।।
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল।।
টুটইতে নাহি টুট প্রেম অদভত।
যৈসনে বাঢ়ত মৃণালক সুত।।

তাই বলি কৃষ্ণের মত সুপুরুষের প্রেম উপেক্ষা করিও না।

রাইএর দূতী আসিয়া বলিল "হে কৃষ্ণ রাইএর মনে এতটুকুও স্বস্তি নাই। তার হাসি দূরে পলাইয়াছে, চক্ষু বাহিয়া জলধারা ঝরে, মুখে বাণী নাই, অধর শুষ্ক, ম্লান।"

'সরস বিলাস হাস সব দূর গেল।'
'অবিরল নয়ন ঝরয় জলধার॥'
চরকি চরকি বহু লোচন লোর।
অধর সুখায়ল ন নিকসই বোল॥

তাহার নয়নজল বহিয়া বহিয়া চরণতলে পতিত,—যেন স্থলকমল (রক্ত চরণ) পরিণত জলকমলে। চির অরুণ অধর তাহার পাংশুবর্ণ,—নব কিশলয় যেন শিশির ম্লান।

নয়নক নীর চরণতল গেল।
থলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল॥
অধর অরুণ নিমিষ নহি হোয়।
কিশলয় শিশিরে ছাড়ি হলু ধোয়॥

সে আর তোমার দর্শন বিনা একমুহূর্ত্তও বাঁচিবে না।

তুয় দরশন বিনু তিলাও ন জীব।

—উভয়ের সন্দর্শন, সম্ভাষণ ও মিলন চিত্রও কাব্যরসের অফুরন্ত উৎস। ভীতা চকিতা শ্রীরাধা ইতস্ততঃ করিতেছেন ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—হে সুন্দরি—তোমার ভয় কি? তোমার ভয়েই দেখ সবাই পলাইল, তুমি আবার কাহাকে ভয় করিতেছ?

কবরী ভয়ে চামরি গিরি কন্দরে মুখভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণি নয়ন ভয়ে স্বরভয়ে কোকিল গতিভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি॥

কৃষ্ণের কথায় রাইএর শঙ্কা ও দ্বিধা দূর হইল।

ইহার পর রাধাকৃষ্ণের মিলন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার সাক্ষী চন্দ্র, ভ্রমর পদলেখনী, মধু মসী, ও দ্বিজ কোকিল লেখক।

দ্বিজ পিক লেখক মসী মকরন্দা।
ঝাঁপ ভ্রমর পদ সাখী চন্দা॥

ইহারা মধুমিলন দেখিয়াছে ও লিখিয়াছে—এমিলনে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় ভাবোচ্ছ্বাসে শ্রীরাধিকার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল।

"জইসে ডগমগ নলিনীক নীরে।
তইসে ডগমগ ধনিক শরীরে।।"

বিদ্যাপতির শ্রীরাধা বাকপটু, ছলনাময়ী, হাস্যরসিকা, কপটতাময়ী। এইরূপ মিলনের পর একদিন প্রত্যাগতা হইলে তাঁহার সম্ভোগ-চিহ্নমণ্ডিতা মূর্ত্তি দেখিয়া সখীরা প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিতেছেন—

কুসুম তুলিতে গিয়াছিলাম,—ভ্রমরে অধর দংশন করিল, জ্বালায় যমুনাতীরে আসিলাম, পবন হৃদয়বাস হরণ করিল, অমনি মনোহর গলার হার বাহির হইয়া পড়িল, তাহাকে উজ্জ্বল সর্প ভ্রম করিয়া ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিয়া নখরবিদ্ধ করিল, এখনও আমার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতেছে, তোমরা অকারণেই আমাকে দোষী মনে করিতেছ।

কুসুম তোড়য় গেলাহু যাহাঁ।
ভমরে অধর খণ্ডল তাহাঁ।।
তেঁ চলি অয়লাহুঁ যমুনা তীর।
পবনে হরল হৃদয়-চীর।।
এ সখি স্বরূপ কহল তোহি।
আন কিছু জনি পেলসি মোহি।।
হার মনোহর বেকত ভেল।
উজর উরগ সংশয় গেল।।
তেঁধসি ময়ুরে জোড়ল ঝাঁপ।
নখর গাড়ল হৃদয় কাঁপ।।
ভণে বিদ্যাপতি উচিত ভাগ।
বচন পাটবে কপট লাগ।।

অভিসার—সখী বলিল—চল সখী অভিসারে—অভিসার বিনা জীবন কি সুখময় হয়? হে নতমুখি, লজ্জা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ অভিসারে চল। গমনে যা দুঃখ, তারপর ত জনম ভরিয়া সুখ।

তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।

বিদ্যাপতির রাই পরম কৌতুকপ্রিয়া। তিনি সখীর কথার উত্তরে বলেন— "না, সখি আমার অভিসারে কাজ নাই। কুলটা হইয়া যদি প্রেম বাড়াইতে হয় ত' জীবনে কি কাজ? একতিল আনন্দ, তারপর জীবন ভরিয়া লজ্জা। যে কুলকামিনী, সে স্বামী লইয়াই থাকে। সে কি কখন অপথে যায়? মালতী ভ্রমরকর্ত্তৃকই হয় উপভুক্ত, নতুবা লতার কোলেই শুখাইয়া যায়।"

কুলটা ভই যদি পেম বঢ়ায়ব তেঁ জীবনে কি কাজ।
তিল এক রঙ্গ-রভস-সুখ পাওব বহুত জনম ভরি লাজ।।
কুলকামিনী ভই নিজ প্রিয় বিলসে অপথে কতহু নহি যাই।
কি মালতী মধুকর উপভোগয় কিংবা লতাহি শুখাই।

কবি বিদ্যাপতি ইহার উত্তরে বলেন,—সুচতুরে, আর ছলনা করিও না। কপটতা ত্যাগ করিয়া অভিসারে গিয়া হরিভজনা কর—অন্তকালে তাঁহার নিকট স্থান পাইবে।"

কপট তেজি কছু ভজহ জে হরি সঞ্চে।
অন্তকালে হোয় ধাম হে।

সখী বলেন—"কৌতুক রাখ রাই—অমূল্য সময় রঙ্গ করিয়া হারাইও না। অবসর মানুষের জীবনে অল্প, "অলপেও অবসর—" সময় থাকিতে হরিভজনা কর।

অতএব রাই চলিলেন অভিসারে। বর্ষার ঘোর অন্ধকারময় নিশীথে।

ভীম ভুজঙ্গম সরণা। কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
গগণ সঘন মহীপঙ্কা। বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা॥
দশদিশ ঘন অন্ধিয়ারা। চলইতে খলই লখই নহি পারা॥

কিন্তু এত সঙ্কট, এত অন্ধকার

সব জনি পলটি ভুললি।

অন্ধকারে ভয় কি? অন্তর যে আলোকিত।

অন্তরে শ্যামচন্দ্র পরকাশ।

কোন দুঃখই তাঁহার কাছে দুঃখ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

অভিসার-পথের অভিযাত্রিণী শ্রীরাধিকার দুরুদুরু হিয়ার প্রত্যেক স্পন্দনটি কি সুন্দর ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই ঝাঁপই নীলনিচোল।
কত কত মনহি মনোরথ উপজত মনসিন্ধু মনহি হিলোল॥

এইরূপে—

নব অনুরাগিণী রাধা কিছু নহি মানয় বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ। পথ-বিপথ নহি মান॥

পথে বিঘ্নরাজি প্রেমের আয়ুধে নির্মূল করিতে করিতে চলিয়াছেন।

বিঘিনি বিথারল বাট। প্রেমক আয়ুধে কাট॥

যামিনী ঘনান্ধকারময়ী হইলে কি? মন্মথ হৃদয় আলোকিত করিল।

যামিনী ঘন আঁধিয়ার।
মন্মথ হিয় উজিয়ার॥

রাই চলিয়াছেন পথে ভাবিতে ভাবিতে—"মাধব, তোমার প্রেমের কথা কি বলিব? তোমার অভিসারে সুন্দরী নারী প্রাণে বাঁচে না।

তুয় অভিসারে ন জীয়ে বর নারী।

আজ এই দারুণ রাতে যখন

পন্থ পিছর নিশি কাজর কাঁতি। পাঁতরে ভৈগেল দিগ-ভঁরাতি।
ঝলকই দামিনী দহন সমান। ঝমঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান।।

তখন দিলাম 'ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ' সে তোমার জন্যইত। তোমাকে স্মরণ করিয়া যখন আমার তনু অবশ হইল, অস্থির হইয়া কাঁপিতে লাগিল—

গোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু অথির থর থর কাঁপ।

তখন কি করিতে পারি আর?

যে হরিণী একাকিনী বনে ছিল নিশ্চিন্ত মনে, তাহাকে কন্দর্পব্যাধ আহত করিয়া অভিসার-পথে এমনি করিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে।

বনে ছলি একলি হরিণী। ব্যাধ কুসুমশরে পাউলি রজনী।।

সখীর কথায় কি আমি আসিয়াছি—না কবির উপদেশে?

পিছে হইতে অনুরাগ ঠেলা দিয়া ও হাতে ধরিয়া কাম আকর্ষণ করিয়া আমাকে এপথে আনিয়াছে।

জনি অনুরাগে পাছু ধরি ঠেললি
করে ধরি কামে তিড়লী।

কিন্তু এত করিয়া জীবন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াও 'হায় কই কৃষ্ণ তোমার দর্শন ত' মিলিল না।"

এত করি আইলিহুঁ জীব উপেখি।
এই গোও না ভেল মোহে মাধব দেখি।।

রাইএর দুঃখের সীমা থাকে না। নয়ন-জলে ধরণী ভাসিয়া যায়। রাইএর ক্রন্দনে কবি স্থির থাকিতে পারেন না। অবশেষে তিনি তাঁহাকে লইয়া যান কৃষ্ণ-সকাশে—কুঞ্জমাঝে। 'ঐসন মিলল কুঞ্জক মাঝ।'

মান—বিদ্যাপতির রাধার দুর্জ্জয় মান যেন প্রতিরুদ্ধ প্রবাহের মতই গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। আমরা রাইএর মানভারাক্রান্ত অশ্রুভরা চক্ষুদুটী, নৈরাশ্য-ম্লান কাতর মুখকমলখানি যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত দেখিতে পাই। রাই অনুযোগ করিয়া বলেন

যাবে রহিয় তুয় লোচন আগে।
তাবে বুঝাবহ দৃঢ় অনুরাগে।।
নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে।
কপটহে মাধব কতিক্ষণ বাণে।।

যতক্ষণ চক্ষুর সম্মুখে ততক্ষণ তোমার অনুরাগ, চক্ষের আড়াল হইলেই ভাবান্তর। হে মাধব, কপটতার মূল্য কতক্ষণ থাকে?

রাই ব্যঙ্গ করিয়া বলেন এইরূপ সকলকেই

হসি হসি করহ কি সব পরিহার।
মধু বিখে মাখল শর পরহার॥

হাসিয়া হাসিয়া সকলের সঙ্গেই কি প্রেম করিয়া এমনি ভাবে পরিত্যাগ কর? মধুবিষে মাখা শর-প্রহারে আঘাত কর? তোমার

ম ু সম বচন কুলিশ সম মানস।

রাধা বিলাপ করিয়া বলেন—হায়, আগে যদি জানিতাম এসব। আমি বড় ভুল করিয়াছি।

অমৃত বধি হম লতা লাওল বিষে ফলি ফলি গেল।

আমি বড়ই প্রতারিত হইয়াছি।

সখীরা অভিমানিনীর মান ভাঙ্গাইতে কত চেষ্টা করিলেন, স্বয়ং কৃষ্ণ কত মিনতি করিলেন কিন্তু সবই বৃথা হইল।

অবনত বয়নী ধরনী নখে লেখি।
যে কহ শ্যাম নাম তাহে নহি পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
অভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমলবর নয়নী।
নয়নলোরে বহি যাওত ধরনী॥

মাধব বলেন—করজোড়ে মিনতি করি রাই,—মান ত্যাগ কর। দেখ পূর্ব্বদিকে অরুণোদয় হইল।

'অরুণ পূরব দিশা'। 'গগন মগন ভেল চন্দা'। 'মুদি গেল কুমুদিনী'।

কিন্তু তথাপি কেন তোমার 'মুদল মুখ অরবিন্দা'?

রাই-কমলিনী, মুখ তোল। ঐ দেখ কমল ফুটিল, ক্ষুধিত ভ্রমর মধুপান করিবে। বিরল-নক্ষত্র আকাশে প্রভাতের ভাতি দেখা যাইতেছে। আশায় কোকিল হাসিতেছে। হে মানিনি, ফিরিয়া চাও। ঐ দেখ অরুণ অন্ধকার পান করিতেছে।

তনিহি লাগি ফুলল অরবিন্দ। ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ॥
বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস। সে শুনি কোকিল মনে উঠ হাস।
এরে মানিনি পলটি নেহার। অরুণ পিবয় লাগল অন্ধকার॥

এততেও রাই তেমনি 'অবনত-বয়নী' হইয়াই রহিলেন।

মাধব পুনরায় কহেন,—ছিঃ ছিঃ অভিমান করিয়া বদন কমলে হাসিও লুকাইলে! চাঁদ উঠিয়া যদি সুধাবর্ষণ না করে তাহা হইলে চকোরের কি গতি হইবে? ভাবিয়া দেখ রাই।

বদন সরোরুহ হাসে নুকওলহ তেঁ আকুল মন মোরা।
উদিতেও চন্দা অমিয় ন মুঞ্চয় কি পিবি জীউত চকোরা।।

কৃষ্ণ কতপ্রকারে সাধিলেন—কিন্তু সবই নিস্ফল হইল।

সখীরা পুনরায় চেষ্টা করিলেন—কত বলিলেন মান করিয়া কৃষ্ণের মত সুপুরুষকে হারাইও না। মান করিয়া যদি স্নেহের শেষ হয়, ভাঙা কাচের বালা আর কে জোড়া দিবে? 'ভাল নহে অধিক উদাস'।

'ভাগে মিলয় ইহ শ্যাম রসবন্ত। ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত'।।
'আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত। জনম গমাওবি রোই একান্ত'।।

রাই বলেন,—'সখি, অযথা প্রবোধ দিও না। আমি বেশ জানি সে নিঠুরে'র বচন সুধাসম, হৃদয় পখান'।

'হিয় সন কুলিশ বচন মধুধার। বিষঘট উপর দুধ উপহার।।'
'বচন সুধাসম হৃদয় পখান'

আমি চন্দন-ভ্রমে শিমুলকে আলিঙ্গন করিয়াছি। হৃদয়ে কাঁটার আঘাতই সার হইল।

'চন্দন ভরমে শিমর আলিঙ্গন শালি রহল হিয় কাঁটে'।
'চন্দন ভরমে সেবলি হম সজনি পূরত সকল মনকাম।
কন্টক দরশ পরশ ভেল সজনি সিমর ভেল পরিণাম'।।

আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে।—

এইবার স্বয়ং কবি আসিয়া হাসিয়া বলেন—সব ত বুঝিলাম রাই, কিন্তু অচেনা হাতে জল খাইয়া আগে, পরে জাতি বিচার করার কিছু সার্থকতা আছে কি?

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারী। পানি পিয়ে কিয় জাতি বিচারি।।

প্রেম করিয়া আর কি মান অভিমান সাজে?

সখীরা বলেন 'মানিনি আর উচিত নহি মান'। তাহা ছাড়া এখন দক্ষিণ পবন বহিতেছে। ঐ দেখ অলিকুল উল্লাসে ঘুরিয়া ফিরে কমলের অধর-মধুপান করিয়া।

'রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি যে কর অধর মধুপান'।
'মধুর মধুর পিকবর তরু তরু সব করু করু লতিকা-সঙ্গ'।।

এখন কি মান করিয়া বসিয়া থাকা শোভা পায়?

শ্যাম রাধিকার মনে রোষের স্থলে রসের উদ্দীপনা করিবার জন্য প্রকৃতির উদ্দীপন-বিভাবগুলির দিকে রাধিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। রাই তবুও অটল।

এইভাবে সারা দিনমান কাটিয়া গেল। রাত্রি আসিল। সখীরা বলিলেন,—"দেখ রাই এমন মধুর রাত্রি আর হয় না।

জুড়ি বয়নী চক্‌মক্‌ কর চাঁদনী এহন সময় নহি আন।

এমন বসন্ত রাত্রে মনসিজ কোন্ না যুবতীর প্রাণে বাণ হানে? ধন্য ধন্য তুমি এমন রজনীতে কিনা 'হরি পরিহরি' অভিমান করিয়া রহিয়াছ। হে রাই, মান ত্যাগ কর। রাই তথাপি অবিচলিত। তাঁহার দুরন্ত মান যেন শ্বসিয়া শ্বসিয়া হৃদয়কে শ্বসিয়া শ্বসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বলেন।

জলথল কুসুম কৈসন হোর মালা।

জলের কুসুম আর স্থলের কুসুমে কি মালা হয়?

তোড়ি জোড়িয় যাহা গেঁঠে পএ পড়তাঁহ
তেজ তম পরম বিরোধ।

যেখানে ছিঁড়িয়া জোড়া দেওয়া যায় সেখানে গিঁঠ পড়ে। কেনা জানে আলোক ও অন্ধকারে পরম বিরোধ? সখি, কৃষ্ণরাধার পুনরায় মিলন হওয়া অসম্ভব। আমার খুব শিক্ষা হইয়াছে, আর নয়।

জনম হোয়য়ে জনি জঞো পুনু হোই।
যুবতী ভই জনময় জনু কোই॥

পুনরায় কাহারও যদি জন্ম হয়ত, যুবতী হইয়া কেহ যেন এ ধরায় না জন্মায়। হায় এমন কোনো ঔষধ যদি পাইতাম—তাহা হইলে পুরুষপ্রেমের জন্য এমন করিয়া জ্বলিয়া মরিতে হইত না। রাই বলেন—

পুরুখ-হৃদয় জল দুঅও সহজে চল।

পুরুষ-হৃদয় ও জল দুইই সমান চঞ্চল। সেই পুরুষ-প্রেমে কেহ যেন বিশ্বাস স্থাপন না করে!

এইরূপ কত আর দেখাইব? চিত্রের পর চিত্রে রাধিকার বাক্যচ্ছটায় এমনি করিয়া এক দুর্জ্জয় অভিমানিনীর ছবি অঙ্কিত হইয়াছে।

বিরহ—পূর্ব্বরাগ, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, প্রেম-বৈচিত্ত্য, দানলীলা, বসন্তলীলা, মান প্রভৃতিতে বিদ্যাপতির ভাবধারা তরঙ্গলীলায় ছুটিয়া চলিয়াছে। চিত্রের পর চিত্রে তাহা যেমন উদ্বেল, তেমনি প্রাণস্পর্শী। কিন্তু বিরহ-অনলে কবির কবিত্ব যেমন নির্ম্মল, প্রগাঢ় ও প্রদীপ্ত হইয়াছে তাহা আর কোথাও নহে।

বিরহ-গানের ভাব-সুরধুনী মহাপ্রেমের মহাসমুদ্রে গিয়া পৌঁছিয়াছে। অশ্রুজলে বিরহের দৈহিক কামনার মালিন্য কোথায় বিধৌত হইয়া গিয়াছে।

এখানে দেহের বর্ণনা সংযত হইয়া আসিয়াছে, অলঙ্কারের শিঞ্জন প্রায় নীরব। কেবল নিরাভরণ নিরাবরণ ভাবোচ্ছ্বাসে গূঢ়গহন রসের স্বষ্টি। শিশির-মথিতা পদ্মিনীর মত মলিনা তাঁহার রাধিকা। নাই পূর্ব্বের সেই মুখর বাক্যচ্ছটা, নাই সেই গরবিণী ময়ূরীমূর্ত্তি। কৃষ্ণ বিনা আজ সকলি শূন্য।

তিনি কাঁদিয়া বলেন,

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী"।
"কৈসনে যাওব যমুনাতীর। কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটীর"॥

হায়! আমার এ দগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা কে বুঝিবে? কানু যদি কখনও রাই হইত এ নিদারুণ ব্যথার মর্ম্ম বুঝিত। তিনি কাতরে বিলাপ করিয়া বলেন—

হম সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হোয়ব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহ-বাধা॥

চণ্ডীদাসের রাইও বিরহে বিলাপ করিয়া বলিয়াছেন এই কথাই—

কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্ব-তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরিতি কেমন জ্বালা॥

বিদ্যাপতির রাই বলেন—হে হরি, আমার প্রাণ যে কণ্ঠাগত হইল তোমার বিরহে। তৈলশূন্য প্রদীপের মত জ্বলে আমার প্রাণ। 'বিনু সিনেহে বরই জনি দীবে।' তোমার আশাপথ চেয়ে চেয়ে আর কতকাল রহিব হে শ্যাম!

নখর খোঁয়ায়লু দিবস লিখি লিখি।
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ পেখি॥

হায়! আমার এমন কেহ হিতৈষী নাই যে তাঁহাকে বুঝায় যে, তুমি লক্ষ কোটী লোকের প্রভু ও স্বামী, সকলের আশা তুমি পুরাও প্রাণনাথ, শুধু আমাকে ভুলিয়া যাও কেন?

নহি হিত মিত কোউ বুঝাবয় লাখ-কোটি তোহে সাঞি।
সবক আশা তোহে পুরাবহ হম বিসরহ কাঞি॥

এইরূপ পদগুলিতে ভাল করিয়াই বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব কবিগণ শাস্ত্রীয় নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাদের কাব্যে ভক্ত ও ভগবানের লীলা কথাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্রের মতে মাধুর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ করিলে রসাভাস হয়। বিদ্যাপতি এই রস-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বৈষ্ণবও ছিলেন না। সে জন্য এ প্রশ্নই উঠে না।

রাই বলিতে থাকেন—কানু বিহনে আমি এজীবন লইয়া কি করিব? যে পথে কানু গিয়াছে সেই পথে আমার মনও গিয়াছে। 'সে পথে মনোরথ গেলহি মোর'।

হায়! আমি যে আশালতা লাগাইয়াছিলাম তাহা আমার চোখের জলে প্লাবিত, জীবনে আর কাজ কি?

আশক লতা লগাওল সজনি নয়নক নীর পটায়।

আমার হরি মথুরাপুর চলিয়া গিয়াছেন, আমি যে ছিন্ন মালতীর মালার মত বিপথে পড়িয়া রহিলাম। দিনরজনী আমার কেমন করিয়া কাটে?

হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যেসে মালতীক মালা।।
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।।

আমার মুখের হাসি, নয়নের নিদ্রা প্রিয়তমের সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে।

নয়নক নিঁদ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাশ।।

প্রভু, তুমি বিনা আমি আর বাঁচিতে চাহি না। রাই বলেন—প্রাণত্যাগ করিলে দুর্লভ প্রভু আমার নিশ্চয় সুলভ হইবে।

দুলহ পহু মোর সুলহ হোয়ব অনুকল হোয়ব বিধি।

এই একটি ছত্রে প্রেমের প্রগাঢ়তা কি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। এখানে ফরাসী কবির একটি লাইন মনে পড়ে—

Kiss me when I am dead and I shall feel it.

রাই কহেন—সখি, তোরা আমার কর্ণে শ্যামনাম কর—শুনিতে শুনিতে যেন কঠিন প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

শ্রবণহি শ্যামনাম করু গান। শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।।

তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কখন বলেন—হায় হায়—

কি মোর করম অভাগি।

সিন্ধু নিকটে থাকিয়াও যদি কণ্ঠ শুকায়—

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব কে দূর করব পিয়াসা।

চন্দন-তরু যদি সৌরভ ছাড়ে, শশধর যদি অগ্নিবর্ষণ করে,

চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব শশধর বরিখব আগি।

'শ্রাবণ মাহ ঘন-বিন্দু ন বরিখব।' তাহা হইলে কে কি করিতে পারে?

"পিয়া বিন পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা'। 'যৌবন জনম বিফল ভেল'।

প্রত্যেকটি পদেই হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস। মর্ম্মের জ্বালা শত শিখায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া বিদ্যাপতির রাইএর দিন যায়। আবার বর্ষা আসে। সেবার আসিয়াছিল মিলনে, এবার আসিল বিরহে। তেমনি নবঘন আকাশে, তেমনি ঝঞ্ঝার গরজন, তেমনি কুলিশপাত। রাধার বিরহ আজি লক্ষগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ফুকারিয়া কাঁদিয়া কহে—

ই ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঁওয়ায়ো হরি বিনু দিন রাতিয়া॥*

রাই বলেন—হরি বিনা এমন দিন কেমন করিয়া কাটে? এযে বড় দারুণ দিন।

ধারা সঘন বরষ ধরনীতল বিজুরি দশদিশ বিন্ধই।
ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনী বিরহিণী কৈসে জীবই॥

রাই বলেন

সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল হেরি জীউ নিকসয় মোয়॥

তিনি বলেন সখি আমার

যৌবন ভেল বনবিরহ-হুতাশন।

রাইএর এই শোকোচ্ছ্বাস সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রাণকে কাঁদাইয়া আকুল করিয়া তোলে, মানবাত্মার চিরন্তন বিরহ যেন জাগাইয়া তুলে।

বর্ষা-বিরহের অন্তর বাহিরের অশ্রুধারা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবাত্মার মিলন ঘটাইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিদের বর্ণিত বর্ষাও যেন বিশ্বপ্রকৃতির বিরহিণী রাধামূর্ত্তি। সেও যেন শ্রীরাধার মতই মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আকুলতা, তন্ময়তা ও বেদনাকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই বর্ষা, বৈষ্ণব কবিকুলের রাইএর বিরহিণী মূর্ত্তি, মানবাত্মার চিরন্তন মিলনতৃষ্ণা ও অনন্তের জন্য সান্তের রসাবেগ (Yearning)—তিনই যেন এক। যেন একই অখণ্ড লীলারহস্যের বিভিন্ন রূপ।

*কেহ কেহ বলেন এই পদটি বাঙ্গালার কবিশেখরের। "বিদ্যাপতি কহ"র স্থলে "ভণহ শেখর", হইবে।

শ্রীমতীর এ ক্রন্দন ত' শুধু তাঁহারই নয়, এ যেন সমগ্র বিশ্ববাসীর বিরহ-ব্যথিত হিয়ার। বর্ত্তমান যুগের কবি এই ভাবটিকে নিম্নলিখিত কবিতায় ফুটাইয়াছেন—

অক্রূরের রথে চড়ি' লীলারঙ্গ পরিহরি' কবে শ্যাম হায়,
কাঁদাইয়া গোপীগণ কাঁদাইয়া বৃন্দাবন গেল মথুরায়।
গন্ধে মিলাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ অনির্ব্বচনীয়,
ইন্দ্রিয়ের রসায়ন ভাবে হয়ে নিমগন হলো অতীন্দ্রিয়।
উঠিল শ্রীরাধিকার বুক ফাটা হাহাকার বিদারি গগন,
'কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ দাও দরশন।''
কাঁদে তায় প্রতি শাখী গোকুলের মৃগপাখী রাধিকার শোকে,
কাঁদে গোপগোপী যত, অশ্রু ঝরে অবিরত জটিলারও চোখে।
অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনিক ধূপে শ্যাম বৃন্দাবনে।
তাই আজো রাধিকার আর্ত্তনাদ হাহাকার বাজিছে ভুবনে।
গুমরে গিরির বুকে, ধ্বনিছে নির্ঝর-মুখে, নদী কলকলে,
মর্ম্মরিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে খনে খনে বারিদ মণ্ডলে।
জীবনে জীবনে ব্যথা জাগাতেছে ব্যাকুলতা অজানার টানে,
মুখে অন্ন নাহি রুচে, চোখে ঘুমঘোর ঘুচে, চাহি কার পানে?
সে বিরহ আজো বাজে, মন নাহি লাগে কাজে, কারে যেন চায়,
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন সুখে প্রাণ না জুড়ায়।
মান যশ ধন জন তৃপ্ত করে না ক' মন, মিটে না ক' সাধ,
একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হ'য়ে যায়, সকলি বিস্বাদ।
কাহার বরণ স্মরি মেঘ হেরি শির'পরি পরাণ উদাস!
প্রেয়সী রহিতে কোলে উন্মনা তাহারে ভোলে, শ্লথ, বাহু-পাশ।
ব্রজের সজল-আঁখি যত মৃগ যত পাখী নব জন্ম লভি,
হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে শত শত কবি?
রাধার বিরহ-রাগে তাদের কল্পনা জাগে হইয়া অরুণ,
তাদের সকল গীত ছন্দিত সকল স্মৃতি করেছে করুণ।
জাগায় সে গূঢ় ব্যথা কোন্ সুদূরের কথা, পূর্ণের পিয়াসা!
তাহাদের গানে গানে ছুটিছে অনন্ত পানে অমৃত তিয়াসা!
নিখিল ভুবন ভ্রমি, বিশ্ব-সীমা অতিক্রমি' লক্ষ্য নাহি জানি;
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত সুরে তাহাদের বাণী?

(বৈকালী—শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর)

বিদ্যাপতির রাইএর বিরহিণী মূর্ত্তি অধিকতর স্ফূর্ত্ত হইয়াছে দূতীর কথায়। দূতী বলেন রাইএর কথা তোমাকে কি কহিব মাধব! তার মুখচন্দ্র করতললীন—যেন কিশলয় ঢাকা বিকচ কমল। নিশিদিন নয়নধারা ঝরিতেছে—যেন খঞ্জন মুক্তাহার উদ্গিরণ করিতেছে।

করতল-লীন শোভয়ে মুখচন্দ। কিশলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥
অহনিশি গরয় নয়ন জলধার। খঞ্জনে জনু উগলিল মোতিহার ॥

তাহার তনু-কুসুমের সবটুকু শুখাইয়াছে, শুধু স্মৃতির সৌরভটুকু আছে।

কুসুম শুকায়ে রহল অছু বাস।

লোচননীরে তটিনী রচনা করিয়া সেই কমলমুখী তাহাতে অবগাহন করে।

লোচন-লোর তটিনী নিরমান। ততহি কমলমুখী করত সিনান ॥

নয়নের জলে তার নদী বহিতেছে, আর সে তাহার তীরে পড়িয়া আছে।

নদী বহ নয়নক নীর। পড়লি রহএ তহি তীর ॥

তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন—

পুণিমক চাঁদ টুটি পড়লি জনি চানর চম্পক-দামে।

দিনের বেলার চন্দ্ররেখার মত হইয়াছে সে

দিবসে মলিন জনি চাঁদক রেহা।

তাহার দেহের সকল দীপ্তি গেল, সে চেতন কি অচেতন তাহা পর্যন্ত আজকাল বোঝা যায় না।

চেতন মুরছন বুঝই ন পারি। বুলই ন ভারি।
অনুখন ঘোর বিরহ জর জারি ॥

সর্ব্বক্ষণ সে বিরহ-অনলে দগ্ধ হইতেছে।

সে অনুক্ষণ তোমারই ধ্যান করে। অনুক্ষণ 'মাধব মাধব' করিতে করিতে নিজেই যেন মাধব এইভাবে সময় সময় বিভোর হইয়া থাকে। আপনাকে মাধব মনে করিয়া আপনাতে অনুরক্ত হইয়া পড়ে। এমনি তদ্‌গত ভাব—এমনি আত্মহারা তন্ময়তা।

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিগরল আপনগুণ লুবধাই ॥

* * *

আপন বিরহে আপন তনু জরজর জীবইতে ভেল সন্দেহা

প্রেমের এমন আত্মবিস্মৃত ভাব বিশ্বসাহিত্যে কোথাও আছে কিনা জানি না। দার্শনিক তত্ত্বের দিক হইতে ইহাই ত ব্রহ্ম সাধনার চরম পরিণতি—সোহহং বাদের রসময় রূপ। ইহাই সাধকের সমাধির নির্বিকল্প অবস্থা। ভেদাভেদজ্ঞান-রহিত অদ্বৈত ভাব।

দূতী বলেন রাইএর অবস্থা এমন হইয়াছে, মাধব, যদি শোনত, স্থির থাকিতে পারিবে না।

ধরনী ধরি ধনি কত বেরি বৈঠই পুনতহি উঠই নহি পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি নয়নে গলয় জলধারা॥

তাহার আর পূর্ব্বের সে কান্তি নাই। দেহ শয্যায় লীন, অমা রজনীর শশিরেখার মত।

শযন নগন ভেলা তাহারি দেহা।
কুহূ তিথি মগনি যইসনি শশি-রেহা॥

তাহার আর কিছুই নাই। যাহার যাহা লইয়াছিল সকলকে তাহা ফিরাইয়া দিয়া সে আজ ঋণমুক্ত।

শরদক শশধর মুখরুচি সোঁপলক হরিণক লোচনলীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোঁপল পাএ মনোভাব-পীলা॥
দশন দশা দাড়িবকে সোঁপলক বন্ধুরে অধর-রুচি দেলি।
দেহ দশা সৌদামিনী সোঁপলক কাজর সখি সখা ভেলি॥

শরচ্চন্দ্রকে মুখরুচি, হরিণকে লোচনলীলা, চমরীকে কেশপাশ সে ফিরাইয়া দিয়াছে। আরও দাড়িম্বকে দশন, বাঁধুলী ফুলকে অধরকান্তি, বিদ্যুৎকে দেহ-লাবণ্য, এইরূপে সবাইকে সব ফিরাইয়া দিয়া সে আজি কজ্জল-ম্লান। প্রাণটুকু তার আছে শুধু, তোমার অনুরাগের স্মৃতি লইয়া। দুঃখের কথা সব চেয়ে এই যে,—হে হরি, যাহার সহিত হৃদয় ভাগ করিয়া লইয়াছ, তাহার দুঃখে কি তোমার দুঃখ হয় না? সে দুঃখিনীর প্রতি কি তোমার দয়া হয় না?

আপন পরাণ পিয়া যা সঞে বাটল হিয়া
তাহি দুখ তোহে নহি লাগে।

একথা কি জান কানাই যে সে জীবন ইন্ধন করিয়া স্মৃতির অগ্নি জ্বালিয়া হোম করিতেছে? সে হৃদয়-বেদীতে মদনানল জ্বালাইয়া বৃন্দাবনে প্রেমের তপ করিতেছে?

জীব করি সমিধ সঙর করি আগী।
করতি হোম বধহো তবহ ভাগী॥

ইহাতে তাহার যদি মৃত্যু হয়, তুমি তার বধের ভাগী হইবে—মনে রাখিও, কানাই।

অবসেও জীব তেজতি তুয়া লাগি। তাক মরণ বধ হোয়বহ ভাগী॥

ভাবসম্মিলন—কল্পলোকে পুনর্মিলন বিদ্যাপতির কবিত্বে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে! মিলনের ভাবোল্লাসে কবির হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনির্ঝরিণী যেন সহসা বাধামুক্ত তরঙ্গিনীর ন্যায় মানসতটভূমি প্লাবিত করিয়া অনন্তের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।
তাহার রাধা আজ বলেন—

কি কহব রে সখী আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।
দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল। হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল।।
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল হরি-পরসাদ।।

আজ তাঁহার জীবন-যৌবন সফল হইল। দেহ, মন, জীবন-যৌবন হরির পদতলে নিবেদন করিয়া দিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন। তিনি বলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ দশদিশ ভেল নিরদন্দা।।
আজ মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সব সন্দেহা।।

আজ রাধাকৃষ্ণের মিলনে সহসা সকলি অভিনব রূপ ধারণ করিল।

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ নব নব বিকশিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল মাতল নব অলিকুল।।
নবল রসাল-মুকুল মধুমাতি নব কোকিল কুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনতায়ই নব রসে কাননে ধায়।।

আজ সকলি মধুর। "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—"।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি। মধুর কুসুম মধুমাতি।।
মধুর বৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ।।
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ। মধুর মধুর রসরঙ্গ।।
মধুর নটবর গতিভঙ্গ। মধুর নটনী নটরঙ্গ।।
আজ, আওল বসন্ত সকল রসমণ্ডল কুসুম ভেল সানন্দ।
ফুলনি মল্লী ভুখল ভ্রমরা পীবি গেল মকরন্দ।।

প্রণয়-পয়োধি জলে আজ যেন চরাচর মগ্ন। এ যেন মন্বন্তর।

প্রণয়-পয়োধি জলে এল ঝাঁপল ঈ নহি যুগ অবসানে।

শ্রীরাধিকার মত আজ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও 'চন্দ্রোদয়ারম্ভে অম্বুরাশির' ন্যায় প্রেমের পয়োধির উচ্ছ্বাস।

রাধাবদন হেরি কানু আনন্দা।
জলধি উছলে যৈসে হেরইতে চন্দা।।
পুলকে পূরল তনু হৃদয়ে হুলাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।।

আজিকে আকাশ, বাতাস, পুষ্পপল্লব, তরুলতা—সকলি প্রেমে মত্ত, প্রেমোন্মত্ত আভীর বালবৃদ্ধবনিতা, প্রেম পাগল বৃন্দাবনের পশুপক্ষী।

রাই বলেন—

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সে পরিপূর।।

আপন আনন্দে তিনি আপনি পরিপূর। তাঁর জীবনে নববসন্ত জাগিয়াছে।

দখিন পবন ঘন অঙ্গ উগারএ কিসলয় কুসুম-পরাগে।

আজ সারা বিশ্বপ্রকৃতির জীবনেও যেন নববসন্ত-সঞ্চার হইয়াছে। আজিকার দিনে—

মলয় পবন ডোলয় বহুভাতি।
অপনে কুসুম রসে অপনি মাতি॥

কি সুন্দর এই চিত্রখানি! মলয়পবন মধুবর্ষণ করিয়া আন্দোলিত হইতেছে, কুসুম আপনার রসে আপনি মাতিয়াছে। শ্রীরাধিকার মতই তাহারাও আপনাদের আনন্দে মাতোয়ারা। আজি রাধাকৃষ্ণের মিলনোৎসব। আজিকে যেন বসন্তেরও মিলনোৎসব। প্রকৃতির কুঞ্জ জ্যোৎস্নাধবল, মধুকর-রমণী মঙ্গল গাহিতেছে, দ্বিজবর কোকিল মন্ত্র পড়াইতেছে, মকরন্দ আচমনের জল যোগাইতেছে, সোনালি কিংশুক তোরণ সাজাইতেছে, বেলাফুল লাজাঞ্জলি ছড়াইতেছে। কেশুকুসুম সিন্দূর দান করিতেছে। শ্রীরাধিকার মিলনের সঙ্গে যেন সারা বিশ্বও মিলনের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

লতা তরুবর মণ্ডপ জিতি। নিরমল শশধর ধবলিয় ভীতি॥
পঁউ অনাল অইপন ভল ভেল। রাত পরিধান পল্লব দেল॥
দেখহ মাইহে মনচিত লায়। বসন্ত বিবাহ কাননে থলি আয়॥
মধুকর-রমণী মঙ্গল গাব। দ্বিজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব॥
করু মকরন্দ হথোদক নীর। বিধু বরিয়াতী ধীর সমীর॥
কনক কেসুয়া মূতি তোরণ তুল। লাজ বিথরল বেলিক ফুল॥
কেশু কুসুম করু সিন্দূর দান। যৌতুক পাওল মানিনী মান॥

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্থাবর,-জঙ্গম, জীবজড় সকল সৃষ্ট পদার্থকে মুগ্ধ করিয়াছে ও সকলের মধ্যেই এক নবজীবন ও মধুরিমার সঞ্চার করিয়াছে। এ কথা বিদ্যাপতির পুনর্মিলন গানে বাণী-রূপ লাভ করিয়াছে।

আজ এই মিলনোৎসব উপলক্ষে প্রকৃতির কি বিপুল আয়োজন।

অভিনব পল্লব বইসক দেল।
ধবল কমল ফুল পুরহর ভেল॥
করু মকরন্দ মন্দাকিনী পানি।
অরুণ অশোক দীপ দিহু আনি॥
সপুণ সুধানিধি দধি ভল ভেল।
ভমি ভমি ভমরই হকারই দেল॥
কেশু কুসুম সিঁন্দূর সমভাস।
কেতকী ধূলি বিথুরলহ পড়বাস॥

প্রকৃতি নবকিশলয়ে আসন পাতিয়া দিল, শ্বেত কমল বরণডালা সাজাইল, মকরন্দ হইল মন্দাকিনী-সলিল, অরুণ অশোক কুঞ্জবনে দীপ জ্বালিয়া দিল, পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নার দধি পাঠাইয়া দিল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল, কিংশুক কুসুম সিন্দুর-দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিল, কেতকী-পরাগ পট্টবস্ত্র বিছাইল।

এমন দিনে রাইএর

হরিনিধি মিলল সকল সিধি ভেল।

তাঁহার আর কিসের অভাব? সকল দিক দিয়া তিনি আজ নিজেকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন

যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল হরি পরসাদ।

তিনি এতদূর কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন—

কি পুছসি হে সখি কানুগুণ নেহা।
এহি পরাণ বিহি গড়ল ভিন দেহা।

এইবার কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলেন

জীবক জীবন হম তুহুঁ জানে।

আজও তিনি প্রেমে এমনি আত্মহারা—যে সখীকে বলেন

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহো পিরিতি অনুরাগ বখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥*

আজ রাইএর প্রেম তিলে তিলে নূতন হইয়া প্রসার লাভ করিয়া অসীমে পৌঁছিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ভাবে প্রেমে একাকার হইয়া গিয়াছে। সেখানে তৃপ্তি, অতৃপ্তি, সুখ, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সব যেন মগ্ন হইয়াছে। বিরহ মিলনের আর সীমারেখা পর্য্যন্ত নাই যেন।

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥

আজ লক্ষ লক্ষ কোকিল ডাকুক, উদিত হউক লক্ষ চন্দ্র, পঞ্চ ফুলশর আজ লক্ষ ফুলবাণে পরিণত হউক, বহুক মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ, রাধিকার তাহাতে কিছু যায় আসে না। আজ তাঁহার প্রিয় মিলন, আজ তাঁহার প্রেমনিবিষ্ট চিত্ত প্রকৃতিস্থ, আজিকে তাঁর প্রিয়তমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

প্রেমভক্তি-পথের পথিকের ইহাই কাম্য, ইহাই তাহার চরম পরিণতি,—ভক্তের ভগবানে আত্মবিসর্জ্জন।

---

*কেহ কেহ বলেন এ পদটি বিদ্যাপতির নয়,—ইহা কবিবল্লভের।

বৈকুণ্ঠের ভগবান যেমন সাধারণ মানবের নিকট রহস্যময়, অতীন্দ্রিয়, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণও তেমনি সাধারণের নিকট রহস্যময় এবং রাধাকৃষ্ণলীলা ততোধিক রহস্যাবৃত। একমাত্র রস-সাধক যাঁহারা, তাঁহারাই শুধু এ রহস্যজাল ভেদ করিতে সমর্থ। বৈষ্ণবকবিকুল এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। কোন্‌ নিভৃতে নির্জ্জনে নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত কোন শুভ মুহূর্ত্তে মিলিয়াছিলেন, শ্রীরাধিকার কিরূপভাবে মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, কবে কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধিকা বিরহে কিরূপ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, কৃষ্ণমিলনে তাঁহার কি সুখের উদয় হইল, কিরূপে রাই অভিসার পথে সকলবাধা জয় করিয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে গমন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিলনে কৃষ্ণের কত সুখ হইল, এ সকলই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি সাধক কবিগণ তাঁহাদের সাধনা দ্বারা অনুভব করিয়া কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। এই কবিকুল যেন নিজেরাই এক একটি রাধিকা। রাধিকা শব্দের অর্থ আরাধিকা। তাঁহাদের মনই বৃন্দাবন, তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তি-সাধনায় স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এই মনোবৃন্দাবনে আসিয়া লীলা করিয়াছেন। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তাঁহাদের মনেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই আজ তাঁহাদের প্রসাদে আমরা জানিতে পারি,—মধুর প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তিকা এই রাধাকৃষ্ণ লীলা-কথা। আর জানিতে পারি, শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠে। নতুবা সাধারণ মানুষের কাছে তাহা চিরদিন অজ্ঞাতই থাকিত। জানিত শুধু সাধকেরা, সর্বজ্ঞেরা।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনে এই লীলা প্রকট হয় এবং তখন হইতে প্রেমধর্ম্মের বাণী মানব-সমাজে প্রচারিত হয়। বৃন্দাবনে যেকালে এ লীলা প্রকট হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, সেকালের লোকেরাও ইহার কিছুই জানে নাই। গোপীগণের মাতা পিতা, স্বামিপুত্র, স্বজনাদিও এ রহস্য জানিতেন না। অন্যে পরে কা কথা।

প্রাকৃত জগতের লোক এই মধুর প্রেমধর্ম্মের অপপ্রয়োগ করিবে বলিয়াই বোধ করি, কৃষ্ণভগবান এই লীলা করেন গোপনে, অতি গোপনে। যাঁহারা অধিকারী, যাঁহারা সন্ধানী, তাঁহারই ইহার সন্ধান পাইলেন। অধিকারী ভক্তগণ, সাধক কবিগণ সেই পথ অনুসরণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমার্থ লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া গেলেন মানবের জন্য রাগাত্মিক সাধন-প্রণালী আর সাধক কবিবৃন্দ দিয়া গেলেন জগৎকে তাঁহাদের অপূর্ব্ব অনবদ্য কাব্য—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার পদাবলী।

কবি বিদ্যাপতি এই সাধক কবিবৃন্দের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি তাঁহার কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধিকার মতই শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতেছেন—

"মাধব বহুত মিনতি কর তোয়।
দয় তুলসী তিল দেহ সোঁপল দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।"
"মাধব হম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময় অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।"
"ভনই বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে তুয় বিন গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি অব তারণ ভার তুহারা।।"
"তুহুঁ জগতারণ জগতে কহায়সি।
জগবাহর নহ ত মুই ছার।।"
কিয়ে মানুষ, পশু পাখী, জনমিয়ে।
অথবা কীট পতঙ্গে।।
করমবিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ।
মাধব মতি রহু তুয় পরসঙ্গে।।
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর।
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্ব।
তিল এক ঠাঁই দেহ দীনবন্ধু।।"

চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি যেমন চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়া, পূর্ব্বরাগ মিলন, অভিসার, মান, বিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতির বাণীরূপ স্বতন্ত্রভাবে ক্রমশঃ অঙ্কিত করিয়া এক অখণ্ড সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, পদাবলীর চণ্ডীদাসে তাহা দেখিতে পাই না। তাঁহার কাব্যে প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ ভাবসম্মিলন ও মিলনোচ্ছ্বাস এরূপভাবে ওতপ্রোত যে বিরহ, মান, অভিমানের বৈচিত্র্য বিদ্যাপতির মত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ স্থলেই রাইএর আত্মহারা ভাবটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীদাস সহজভাষার সহজভাবের কবি, কিন্তু ভাব এতই গভীর অতলস্পর্শ, যে তাহার সমকক্ষতা অপর কোনো বৈষ্ণব কবির রচনায় পাওয়া যায় না। তিনি লীলার এক একটি অঙ্গ অতি সহজ কথায় সহজ ভাবে বর্ণনা করেন, অথচ তাহা প্রাণস্পর্শ করিয়া মরমে বিদ্ধ হইয়া থাকে। অতি সহজ কথায় এরূপ ভাবঘন জোরালো প্রকাশভঙ্গী এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন কবির কাব্যে দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ--কৃষ্ণ রাধিকাকে দেখিলেন একদিন স্নানের ঘাটে। দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।*

এ বর্ণনার তুলনা নাই। এই চিত্র চির দিনের জন্য রসিকজনের অন্তরে গ্রথিত হইয়া থাকিয়া গিয়াছে। রাই তাঁহার দিকে হাসিয়া চাহিল।

'সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ হসিত বদনে চায়'।
'হাসির ঠমকে চপলা চমকে নীল শাড়ী শোভে গায়'॥

আবার সে হাসি কেমন! না, তাহাতে সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে।

হাসিতে খসয়ে সুধারাশি

সহসা সে চলিয়া গেল সম্মুখ দিয়া।

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল।

নীলাম্বর-পরিহিতা শ্রীরাধিকার চকিত চলন টুকুর কি সুন্দর চিত্র! কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া আত্মহারা হইলেন।

---

*কেহ কেহ বলেন, এই পদ লোচনদাসের রচিত, কিন্তু পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের নামেই আছে।

পুড়ায় কেবল নয়ন যুগল চিনিতে নারিনু কে।

মুগ্ধ হইয়া তিনি প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইলেন।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ—চণ্ডীদাসের রাই কৃষ্ণকে দেখিবার পূর্ব্বেই শুধু নাম শুনিয়াই মজিয়াছেন।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।

তখন হইতেই তিনি শ্যামকে না জানিয়াই তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

কেমনে পাইব সই তারে?

তারপর যেদিন রাই কৃষ্ণকে স্বচক্ষে দেখিলেন,

'সই কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া মরমে রহিল পশি'॥
'দুইটি মোহন নয়নের বাণ দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচয়ে ধরমে পরাণ সহিত টানে'॥"

ইহার পর হইতেই চণ্ডীদাসের রাই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। এই আত্মহারা ভাবই রাধিকার জীবন ভরিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব-কাননে চায়॥

শ্যামের প্রেমে তিনি এমনি তন্ময় হইলেন যে—

দিবা নিশি দিশি দিশি কালা পড়ে মনে।

তিনি স্বপ্নেও পরাণবঁধুকে দেখেন,

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়র পাশে।

কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার আত্মহারা ভাব এতটা হইয়াছে যে—

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।

মিলন—চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের মিলন-চিত্র অপূর্ব্ব। তখন বসন্তকাল, নির্ম্মল চন্দ্র আকাশে প্রকাশমান, মলয় পবন বহিতেছে, আর ভক্ত কবি সখীরূপে পাশে রহিয়া ভাবভরে গদ্ গদ্ হইয়া চামর ঢুলাইতেছেন।

আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাবভরে গদগদ চামর ঢুলায়ত পাশে রহি দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

এমন সুক্ষণে—

"মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ"। "দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে"।
"দোঁহার নয়নে নয়ন মিলল হৃদয়ে হৃদয় ধরে।"
"দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন উছলল প্রেম হিলোল।"

প্রেমতরঙ্গ দিকে দিকে উছলিয়া পড়িতেছে।

মিলনোচ্ছাস—চণ্ডীদাসের মিলনোচ্ছাসের পদগুলি অতুলনীয়। আত্মহারা শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণবঁধু হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও-দুটি কমল পায়॥

কবি রাইএর মুখ দিয়া স্থানান্তরে বলিতেছেন—

"সতী বা অসতী তোহে মোর মতি তোমারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বসন সালঙ্কার মোর ভূষণে দূষণ বাসি॥"*

প্রিয়তমের পায়ে এমন সুমধুর আত্মসমর্পণের চিত্র বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।

কি দিব কি দিব তোমা মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

চণ্ডীদাসের রাইএর হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা শুধু

ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া নয়ন মুদিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তরও তদুপযোগী।

"রাধে ভিন্ না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইনু আমি॥"

---

*দীন চণ্ডীদাসের এই ভাবের পদ—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান।
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপগোয়ালিনী হাম অতি হীনা না জানি ভজন পূজন।
পিরিতি রসের ঢালি তনুমন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি মন নাহি আন তায়।"
"কুলশীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি কালি দিয়ে দুই কূলে।
এ নব যৌবন পরশরতন সঁপিনু চরণ তলে॥
তুমি রসরাজ রসের সমাজ কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে জনমে জনমে বিমুখ না হও তুমি॥"
"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমার বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম তোহারি চরণখানি॥"

অভিসার—আমরা দেখিতে পাই, সকল দিক দিয়াই চণ্ডীদাসের রাধা অপর বৈষ্ণব কবিগণের রাধা হইতে যেন স্বতন্ত্র। অন্যান্য কবিগণের শ্রীরাধিকা ঘনমেঘের দুর্দ্দিনে শ্যামের সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত আকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। আকাশ মেঘে মেদুর, বনভূমি তমালদ্রুমে শ্যাম, অন্ধকার রজনী। এমন রজনীতে ঘরে থাকিতে না পারিয়া রাধা অভিসার-পথে বাহির হইয়াছেন। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসের রাই চলিয়াছেন অভিসারে এই বর্ষার ঘোর অন্ধকার রজনীতে। চণ্ডীদাসের রাধাও এমন দিনে উতলা হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি বর্ষাভিসারে বাহির হন নাই। বৈষ্ণব কবিবৃন্দের যে নীলশাড়ী প্রেমের বিজয়কেতু, তাঁহার পরিধানে তাহাও নাই। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে রাঙ্গাবাস। আহার-নিদ্রাবিরতা যোগিনীর ন্যায় ধ্যাননিমগ্না, দৃষ্টি তাঁহার মেঘের দিকে স্থিরনিবদ্ধ!

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা।।

তাহা ছাড়া দেখিতে পাই বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের রাধা নিজের জন্যই উচাটন হইয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা নিজের জন্য নহে, শ্যামবঁধুয়া যে এ ঘোর রজনীতে আঙ্গিনার মাঝে ভিজিতেছেন. তাহাতেই তাঁহার পরাণ ফাটিতেছে।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে।।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।

মান—চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা এমনি প্রেমবিহ্বলা যে তাঁহার মান অভিমানকে মনে হয় যেন আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তাঁহার মন কোপ, দ্বেষ, দম্ভ দেখাইতে জানে না। নিশান্তে প্রণয়িনীর গৃহ হইতে ফিরিবার পথে আঙ্গিনায় প্রিয়তমকে বারিধারায় ভিজিতে দেখিলে যাহার "পরাণ ফাটে" সে কেমন করিয়া দুর্জ্জয় অভিমানের দ্বারা প্রিয়তমকে পীড়িত করিবে?

অভিমানে, চণ্ডীদাসের রাধিকার চক্ষু কোপারুণ হয় না, অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়। বিদ্যাপতির রাধিকার মত বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানিয়া দুকথা শুনাইয়া দিবার ইচ্ছামাত্রও তাঁহার মনে জাগে না। তিনি বলেন—

বহু পুণ্য ফলে এ হেন বঁধুয়া আসিয়া মিলল মোরে।

অপরের কোন' দোষ থাকিতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন না। তিনি বলেন—

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু সকলি আমার দোষ।
কাহারে করব রোষ।।

তীব্র অভিমান কাহাকে বলে তাহা তাঁহার ধারণাতীত। তিনি বড় জোর বলেন—

"যাহার লাগিয়া যেজন মরয়ে সে তারে পাসরে কেনে।"

"মুরলী সরল হ'য়ে বাঁকার মুখেতে র'য়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।।"

যিনি প্রিয়তমকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই হৃদয়ে ব্যথা লইয়া ফিরেন, তাঁহার পক্ষে কি মান করা সম্ভব? আধুনিক কবির কথায়—"করতে শাসন তিতে বসন নয়ন-সলিলে।" তাঁহার চক্ষে আমরা বারিধারা ঝরিতে দেখি, কিন্তু তাহাকে অভিমানের অশ্রু বলিয়া মনে হয় না, সে যেন আত্মগ্লানির বা নির্বেদের অশ্রুধারা। তিনি অভিমান করিবেন কি? তাঁহার যে সকল সময়ই কালিয়া কানু হয় অনুভব। সকল দিকেই তিনি সমস্তই শ্যামময় দেখেন।

এমনি অনুরাগের তন্ময়তা, প্রেমের এতই বিহ্বলতা। তাঁহার মান-অভিমান সবই এই প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। সেইজন্য দেখি ভাবসম্মিলনের পার্শ্বে বা মিলনোচ্ছ্বাসের পার্শ্বে তাঁহার মান অভিমানের চিত্র যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে।

বিরহ—বিরহে, মানে কোথাও চণ্ডীদাসের রাইএর বিদ্যাপতির রাধিকার মত দীর্ঘশ্বাস, তীব্র বাক্যজ্বালা বা মর্ম্মদাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা যেন প্রিয়তমের ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। তাঁহার আত্মহারা, আত্মভোলা ভাব সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট, এবং ম্লান, পাণ্ডুর মুখকমলখানি বিদ্যাপতির রাধিকার ন্যায় ক্রোধলজ্জায় আরক্তিম নহে। তাহা যেন অতুলনীয় কারুণ্যে পরিপূর্ণ।

বিরহে তাঁহার রাই যোগিনী সাজিয়াছেন।

"নিজ কায়াপর রাখিয়া কপোল মহা যোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মেঘেরি ধারা।।"
"যেন চান্দের রসের লাগিয়া চকোর থাকয়ে ধ্যানে।"

তিনি এমনি আত্মহারা হইয়া থাকেন—

যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।

শুধু তাহাই নয়, নিজে সর্ব্বক্ষণ শ্যামনাম জপ করেন।

শ্যাম নবমালা বিনোদিনী রাধা জপিতে জপিতে চায়।।

তিনি বলেন—

কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে।।

তিনি সখীকে জিজ্ঞাসা করেন—

"কেন বা এমত হৈল।"
"পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।

না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো।"

তিনি কিছুতেই যখন মন বাঁধিতে না পারেন, তখন ফুকারিয়া বলিয়া উঠেন—

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী।।

কখন ব্যাকুলা হইয়া সখীদের শুধান—কেন আমার এদশা হইল?

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি কেনবা এমত কৈল।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী মানয়ে যেমন দাসী।।
কুলের করম ধৈরয ধরম মরম ফাঁসী।।

তিনি উদাসিনী হইয়া যোগিনীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে চাহেন—

দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।।
কানু গুণ যশ কানে পড়িব কুণ্ডলে।।
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব।।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এত দুঃখ এত কষ্টেও তাঁহার বাক্যে তীব্রজ্বালা নাই। তিনি তবুও বলেন

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন ও দুটি নয়ন তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতুলি নিমিখে নিমিখ হারা।।

তিনি সর্ব্বত্রই কানুকেই দেখেন—

গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া ভোজনে কালিয়া কানু।
ভ্রূযুগ মুদিলে সেখানে কালিয়া কালিয়া হইল তনু।।

বিরহে এমন আত্মহারা ভাব কে কোথায় দেখিয়াছে? কোনো বৈষ্ণব-কবিতেও ইহা নাই। যেখানে বিদ্যাপতির রাধিকা বিরহ-দুঃখে শিশির-মথিতা পদ্মিনীর ন্যায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, চণ্ডীদাসের রাধিকা সেখানে প্রেমসাধিকা। অনুরাগের হোমবহ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া কঠোর তপস্যায় তিনি নিমগ্না। তাঁহার মুখে অভিযোগের সুর অতি করুণ।

সকল ত্যজিয়া শরণ লয়েছি ও দুটি কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল ওহে বংশীধর কি তব উচিত হয়।।

ইহার সহিত বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার জ্বালাময় বচন-বিন্যাসের কি প্রভেদ! চণ্ডীদাসের রাই বলেন—যাহার জন্য আমি

রাতি কৈলুঁ দিবস, দিবস কৈলুঁ রাতি।
ঘর কৈলুঁ বাহির, বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন, আপন কৈলুঁ পর।।

তাহার কি দয়া হইতে নাই? আমার যে—

পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায় রে।

আশাপথ চেয়ে চেয়ে আমার দিনও ফুরাইয়া গেল।

আসিবার আশে লিখিনু দিবসে খোঁয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে দু আঁখি হইল অন্ধ।।

আমি আর পারি না। তোমার সম্মুখে মরিতে চাই—হে কৃষ্ণ, হে প্রাণবঁধু আমার,

বঁধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।

হায়! অন্যত্র মরিয়াও তাঁহার স্বস্তি নাই। তিনি মরিতে চাহেন, কিন্তু সে মরণ হয় যেন শ্যামের সম্মুখে—

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

কৃষ্ণ-বিরহে তিনি যখন স্থির থাকিতে না পারেন, তখন সখীকে জিজ্ঞাসা করেন, "সখি—কৃষ্ণ কি আর ফিরিবেন না? যা তুই আমার কানুকে যেমন ক'রে পারিস বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।"

সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে করিবে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, শ্লেষ নাই কথায়, শুধু আছে দৈন্য, আকিঞ্চন, অনুনয়। রাই বলেন—"সখি তাঁহাকে বলিও—তোমার রাই অন্ধ হইল।"

উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে দু আঁখি হইল অন্ধ।

তোমার রাই মরিতে বসিয়াছে। মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে চাহে। দূতী রওনা হইয়া মথুরায় গিয়া কৃষ্ণকে সকল কথা বলিলেন। আরও বলিলেন—

বিরহ কাতরা বিনোদিনী রাই পরাণে বাঁচে না বাঁচে।"
"দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তবে ঝাট চল ব্রজে যাই।।"

নতুবা আর সে সোণার প্রতিমাকে দেখিতে পাইবে না।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার দুইচক্ষু বাহিয়া জল ঝরিয়া নদী বহিতে লাগিল।

নয়নের জলে বহয়ে নদী

শ্যামচাঁদ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ব্রজে ফিরিয়া চলিলেন।

পুনর্মিলন—পুনর্মিলন বা ভাব-সম্মিলন কল্পনায়। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আর ফিরেন নাই।

ব্রজের কানু যেন পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাইএর সকল দুঃখ, মান, অভিমান নিমিষে ভাসিয়া গেল। বিদ্যাপতির মানিনী রাইএর মত তিনি শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করেন না, মমতামাখানো, করুণায় ভেজা একটু সকরুণ অভিমান স্বরে বলেন—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইত পরাণ গেলে।।

তিনি কুশল জিজ্ঞাসায় আত্মহারা হইয়া পড়েন।

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল। দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
এসব দুঃখ কিছু না গণি। তোমার কুশলে কুশল মানি।।

তিনি কৃষ্ণকে পাইয়া এসব দুঃখ ভুলিলেন।

এসব দুঃখ গেল হে দূরে। হারানো রতন পাইনু কোরে।।

কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি আসিল না। মিলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচ্ছেদ আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়কে জুড়িয়া বসিল। মনে জাগিল একটা দ্বিধা, উদ্বেগ, ভয়—যদি তিনি আবার শ্যামহারা হন! তাই দিবানিশি বিনিদ্র ভাবে কাটাইতে লাগিলেন।

সই অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি।।

তাঁহার অন্তরে অতীন্দ্রিয় দেহাতীত প্রেমই জাগাইল তাঁহার মনে এই ভয়।

তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি।

হারানোর ভয়ে তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া আসে। কিছুতেই তৃপ্তি নাই। বিচ্ছেদ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাই

দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

মিলনেও হারানোর আশঙ্কা তাঁহার মনকে স্বস্তি দেয় না, একটা অতৃপ্তি, একটা অশান্তি প্রাণে ফুলের মালায় কাঁটার মত বিধিয়া রহিয়া যায়।

ইহাকেই বলে প্রেম-বৈচিত্ত্য। এই প্রেম-বৈচিত্ত্য সকল কবির কাব্যেই অল্পবিস্তর আছে। চণ্ডীদাসের প্রেম-বৈচিত্ত্যের তুলনা নাই। বর্ত্তমান যুগের কবি এই প্রেম-বৈচিত্ত্যের স্বরূপ যে ভাবে দেখাইয়াছেন—এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলে অশোভন হইবে না। চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রেম-বৈচিত্ত্য লক্ষ্য করিয়াই ইহা রচিত।

লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়া হিয়া'পরি হিয়া না জুড়ায়,
মলয়জ চুয়া চীর ব্যবধানে সে অধীর প্রাণ পুড়ে যায়।
নিমেষে অন্তর হ'লে কোটি কল্প যুগ ব'লে মনে হয় তারে,
সোহাগের বাণী যত কণ্ঠে এসে পরিণত হয় হাহাকারে।
মিলনে কোথায় স্বস্তি তৃষানলে মজ্জা অস্থি পুড়ে হয় ছাই,
ত্রাসে তৃপ্তি পায় লয়, গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয় 'হারাই হারাই।'

এই প্রেমে কোথা সুখ? দ্রবীভূত হয় বুক এতে পলে পলে,
চুম্বনের সুধা তায় লবণাক্ত হ'য়ে যায় নয়নের জলে।
হাসিতে হাসি না আসে, কাননা পলায় ত্রাসে ছিঁড়ে ফুলহার।
ভূষণে দূষণ বলি মনে হয়, যায় জ্বলি' উৎসব-সম্ভার।
এ প্রেম ব্যথায় গড়া, মরণে বরণ করা অসহ্য জ্বালায়,
উল্লাস করিতে আসি নয়নের জলে ভাসি সখীরা পালায়।
শঙ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্ট নাম-জপ এ গভীর প্রেমে,
ধনুতে জুড়িয়া শর, অবশ পাণিতে স্মর র'য়ে যায় থেমে।
বিরহ-নিদাঘ শেষে মিলন-বরষা এসে কাঁদায় কাঁদিয়া,
দুহুঁ দোঁহা বুকে বাঁধে, "দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে,
বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

[বৈকালী—শ্রীকালিদাস রায়]

রাধাকৃষ্ণের প্রেমচিত্র চণ্ডীদাস যেরূপ নৈসর্গিক ব্যাপকতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এরূপ কেহ পারেন নাই। এই অপূর্ব্ব প্রেমকে তিনি "পিরিতি" আখ্যা দিয়াছেন। ইহার সার্থকতার গণ্ডীর প্রসার যে কি বিপুল, তাহা যিনি সাধক, তিনি ছাড়া অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। তিনি বলেন, এই পিরিতির জন্য জ্বালা বা দুঃখ ভোগ করে নাই যে, সে এই পৃথিবীতে কোনো সুখই পায় নাই!

সই পিরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে কি সুখ জানয়ে তারা।

তাঁহার রাধা যখন বলিতে থাকেন—

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরিতি আর জানি কার হয়।।

যখন তিনি দেখেন তাঁহারই বঁধুয়া তাঁহারই সম্মুখ দিয়া অন্য রমণীর বাড়ী চলিয়া যান—

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া।

আর এ দৃশ্য তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে, তখন তিনি বলিয়া উঠেন—

আমার পরাণ যেমতি করিছে সেমতি হউক সে।

ইহার বাড়া অভিশাপ তাঁহার ভাষায় নাই। তিনি দুঃখ করিয়া যখন বলেন—

বিধি যদি শুনিত মরণ হইত ঘুচিত সকল দুখ।

তখনও চণ্ডীদাস বিচলিত নহেন—

চণ্ডীদাস কয় এমতি নহিলে পিরিতের কিবা সুখ।

তাঁহার মতে প্রেম-পিরিত কঠোর সাধনার ধন। এত অল্পে চঞ্চল হইলে কি সিদ্ধিলাভ হয়? দুঃখই যদি অনায়াসে ঘুচিল, তবে আর সে সুখের গভীরতা কোথা? দুঃখের পাষাণে না ঘষিলে কি পিরিতিচন্দনের সৌরভ বাহির হয়? পিরিতি কঠোর তপস্যা। দুঃখের সাধনায় হৃদয়ের শাখা-প্রশাখায় পিরিতির স্বর্গীয় ভাবকুসুম অপরূপ লাবণ্যে ফুটিয়া উঠে, অন্তর বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া যায়। আর সেই সকল সৌন্দর্য্যের সার, প্রিয়তমের রাসমঞ্চ তখন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে নহে। পিরিতি সহজপ্রাপ্য নয়।

পিরিতি পিরিতি সব জন কহে পিরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহেত পিরিতি নাহি মিলে যথাতথা।"
"পিরিতি অন্তরে পিরিতি মন্তরে পিরিতি সাধিল যে।
পিরিতি রতন লভিল যে জন বড় ভাগ্যবান সে।।"

চণ্ডীদাসের রাই যখন কাতর কণ্ঠে বলেন—

পিরিতি পিরিতি কি রীতি মূরতি হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে পিরিতি গড়ল কে।।"
"পিরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর না জানি আছিল কোথা।
পিরিতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল পরাণপুতলি যথা।।"

চণ্ডীদাস তখনও বিচলিত নহেন। তিনি বলেন—

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পিরিতি না কহে কথা।
পিরিতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে পিরিতি মিলয়ে তথা।।

প্রাণ দিয়া পিরিতি পাইতে হয়। প্রাণের চেয়ে ঐহিক জীবনে বড় আর কিছু নাই। এই প্রাণ উৎসর্গ করিলে তবে পিরিতিধন মিলে। প্রেমের সাহিত্যে কবির এ বাণী বিশ্ববিজয়িনী।

চণ্ডীদাস আরও বলেন—

সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুঃখ যায় তাহার ঠাঞি।

এ পিরিতি পাইতে হইলে সুখের লালসা, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা ত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, আত্মবলিদান দিতে হইবে, আমিত্ব ভুলিতে হইবে। পিরিতি এই তিনটি অক্ষর চণ্ডীদাসের সর্ব্বস্ব, তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তিনি বলেন—

পিরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর এ তিন ভুবন সার।

ইহাই শুধু নয়

এই মোর মনে হয় রাতি দিনে ইহা বই নাহি আর।

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন

প্রীতির সমহ দোসর নাহি আন।
জাহি তুলনা দিহ্ আপন পরাণ।।

জগতে প্রীতির সমান আর কি আছে? শুধু প্রাণের সহিত তাহার তুলনা হয়।

কিন্তু চণ্ডীদাস বলেন—

পরাণ সমান পিরিতি রতন জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরিতি রতন অধিক হইল পরাণ উঠিল দুলে।

তাঁহার নিকট পিরিতিই ভারি হইল। মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস যে প্রাণ, সে প্রাণও পিরিতির নিকট তুচ্ছ।

চণ্ডীদাস বলেন,—এই পিরিতির সীমা-পরিসীমা নাই, ইহা "নিতুই নূতন" "তিলে তিলে নূতন হোয়।" (তাজা-ব তাজা নও-ব নও।) ইহা "তিলে তিলে বাড়ি যায়।" ইহার বৃদ্ধির অন্ত নাই।

ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়য় পরিমাণে নাহি আর।

পরিমাণ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই; ইহা অনাদি, অনন্ত, অপরিমেয়। প্রেমের এত বড় পরিকল্পনা, এত বিরাট ভাবাদর্শ, এত প্রগাঢ় অনুভূতি বিশ্বসাহিত্যে নাই।

চণ্ডীদাসের মত একনিষ্ঠ সাধকই বলিতে পারেন—

পিরিতি নগরে বসতি করিব পিরিতে বাঁধিব ঘর।
পিরিতি দেখিয়া পড়সী করিব তা বিনু সকলি পর।।

চণ্ডীদাসের রসাদর্শ খুব উচ্চস্তরের।

চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

সহজ মানুষ হব রসিক-নগরে যাব
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে।।
সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ম প্রকাশিয়া
হংস প্রায় হইয়া রহিব।

সরূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের লীলার আভাস এখানে কিরূপ সুস্পষ্ট!—

'এ দেহে সে দেহে একই রূপ। তবে সে জানিবে রসেরই কূপ।।
এ বীজে সে বীজে একতা হবে। তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে'।।
'বাশুলি কহে এই সে সার। এ রস-সমুদ্র বেদান্ত পার'।।

এ রসলীলা রসিকজনেরও সহজ-প্রাপ্য নহে। মন্মথদহনের মহাদেবও এই মদনমোহন-লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইতেন।

'রসিক রসিক সবাই কহয়ে কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটীতে গোটিক হয়' ॥
'যেমতি দীপিকা উজরে অধিকা ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া পুড়িয়া মরয়ে পাখা।
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া কামানলে পুড়ি মরে॥
রসজ্ঞ যেজন সে করয়ে পান বিষ ছাড়ি অমৃতেরে' ॥

চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন। তিনি সাধক, তিনি প্রেমিক, তিনি দ্রষ্টা, ঋষি। সুদূর অতীতে এক ঋষি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন—সকল মানব-সন্তানই অমৃতের পুত্র—তিনি তাই আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

আর আমরা দেখি তেমনি ভাবেই চণ্ডীদাস দেখিয়াছিলেন—মানবমাত্রই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সৃষ্টির সবচেয়ে বড় সত্য এই মানুষ—

শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

চণ্ডীদাস ছিলেন দিব্য মানব, সর্ব্বত্যাগী, পরম ভাগবত মহাপুরুষ।

ভারত বরেণ্য তত্ত্ববিদ্যায়। জ্ঞান ও কর্ম্ম-মার্গের আলোচনায় সে জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভক্তি মার্গ বা প্রেমমার্গ তাহাকে আরও বড় করিয়াছে। তাহার শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাহার দর্শনে নয়, প্রেমভক্তি-ক্ষেত্রের কর্ষণেও। এই প্রেমভক্তির চর্চ্চা পৃথিবীর কুত্রাপি এরূপ হয় নাই। আর এই "ঐকান্তিকী ভক্তির" সাধনা বৈষ্ণবসাধকগণ যেরূপ করিয়াছেন, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। বৈষ্ণব কবিকুল ইহার চরম করিয়া গিয়াছেন, আবার চণ্ডীদাস তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই ভক্ত কবিকুলের হৃদয়-রাধা শ্যামের বাঁশরীর সুর শুনিবার জন্য সদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। যেই সেই সুললিত স্বরলহরী কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই মুহূর্ত্তে সে জগৎ সংসারের সকল মায়াবন্ধন কাটিয়া ছুটিয়া যাইত, তাহার প্রিয়তমের উদ্দেশে। তাঁহাদের হৃদয়-রাধার এই যে আকুলতা, এই যে আকূতি, এই যে ব্যাকুল মিলনের আকাঙক্ষা, এই যে একাগ্র ভাগবত-প্রেম, প্রেমভক্তি-মার্গের ইহাই চরম আদর্শ।

এই যে Yearning for Eternity ইহাঁ চণ্ডীদাসের প্রত্যেক পদে গভীরভাবে অনুস্যূত। তাঁহার রাধার এই যে কৃষ্ণমিলন-কামনা ইহা যেন মানুষে

মানুষে সম্ভব নয়—ভক্তের ভগবানকে পাইবার একাগ্র সাধনা ছাড়া যেন ইহা অন্য কিছুই নয়। তাই কাব্য হিসাবে কেবল বিচার করিতে গেলেও পদগুলিকে Romantic না বলিয়া Mystic lyric poetryই বলিতে হয়। জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ এই ভক্তগণের নিকট তুচ্ছ, তাঁহাদের প্রেমধর্ম্ম-সাধনার বরং পরিপন্থী। মনের অভাব-নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান, আর দেহের অভাবনিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম। জীবনে যাঁহারা কোন অভাবই অনুভব করেন না, তাঁহাদের জ্ঞান-মার্গ বা কর্ম্ম-মার্গের প্রয়োজন কি?

ইহার ফল এক দিক দিয়া মন্দও হইয়াছে। যাঁহারা এই সব কবি ও সাধকের মত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ নহেন, অথচ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব যাঁহাদের উপর পড়িয়াছে, এবং বৈষ্ণব পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাঁহারা জীবন-যাপন করিয়াছেন, কর্ম্ম ও জ্ঞানের চর্চ্চার অভাবে তাঁহারা নিশ্চেষ্ট, নারীভাবাপন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন এবং আবার তাঁহাদের প্রভাবে সমগ্র সমাজই তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার্য্য যে, এই উদার ধর্ম্মই মুসলমান আমলে হিন্দুগণকে প্রবল ধর্ম্মান্তরের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

এই সব সাধক কবিগণ বলেন—নদী যেমন ছুটিয়া যায় সমুদ্রের পানে আকুল আবেগে, কিন্তু কেন সে জানে না, তথাপি ছুটিয়া যায়। ইহাই তাহার প্রাণ-ধর্ম্ম। মানবের আত্মাও তেমনি ছুটিয়া যায় ব্যাকুল আগ্রহে পরমাত্মার দিকে—কেন সে কথা সেও জানে না—ইহাই তাহারও প্রাণ-ধর্ম্ম। নদীর এই ছুটে চলা ও মানবাত্মার পরমাত্মার উদ্দেশে অভিযান যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মানুষেরও ইহাই স্বভাব। তবে নানাজন্মের সংস্কারে সে আজ আচ্ছন্ন। তাই সে বিপথগামী। আত্মার এই সহজগতি আজ সে বুঝিতে চায় না, চাহিলেও বুঝিতে পারে না! রস-সাধকেরা বলেন, প্রেমধর্ম্মের সাধনায় মানুষের হৃদয়ে আবার সেই সহজভাব সর্ব্বসংস্কারের বন্ধ ছেদন করিয়া উজ্জীবিত হয়, নিজের স্বভাবগত ধর্ম্ম সজাগ হইয়া উঠে ও তখন শ্রীভগবানকে পাওয়া সহজ হইয়া যায়। এই সত্য উপলব্ধি করানোর জন্যই রাধার জীবনে লোকলাজ, গুরুজনের শাসন, কুলশীল, সতীধর্ম্ম ইত্যাদির সংস্কার বন্ধনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সহজ প্রেমই এই সকল সংস্কারের বাধা চরণে দলিয়া অভিসারে ছুটিতে পারে।

সুতরাং মানুষের পক্ষে যাহা সহজ ও স্বভাব ধর্ম্ম, তাহাকে জাগাইয়া তোলে যে পথ, তাহাই শ্রেষ্ঠপথ এবং সেই পথকেই তাঁহারা আখ্যা দিয়াছেন "সহজিয়া রাগাত্মিক প্রেমধর্ম্মের পথ।"

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-সঙ্গীতে এই রাগাত্মিক প্রেমধর্ম্মকেই রূপ দিয়াছেন। প্রেমধর্ম্মের এই আদর্শই চিরদিন প্রেমধর্ম্ম-পথের যাত্রীর পাথেয়-সম্বল হইয়া থাকিবে।

গোবিন্দদাস

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বিদ্যাপতির সহিত গোবিন্দদাসের এবং চণ্ডীদাসের সহিত জ্ঞানদাসের ভাব, ভাষা ও ছন্দের অনেক স্থলে মিল আছে। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ও জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। পদরচনায় গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে ও জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসকে আদর্শ ধরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। একই বিষয় লইয়া একই ধরণের লেখায় তাঁহারই কৃতিত্ব বেশী যিনি প্রথমে পথ দেখান। বিদ্যাপতি এক ধরণে ও চণ্ডীদাস অন্য ধরণে এই পথের প্রদর্শক। বৈষ্ণবকবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন তাঁহাদেরই প্রাপ্য।

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, কবিবল্লভ প্রভৃতি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা এই দুই কবিরই অনুসারক। বহু স্থলে ভাব, ভাষা ও ছন্দের মিলও দেখা যায়।

গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহাদের আসন শ্রেষ্ঠ কবিকুলের মধ্যেই। বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাস বঙ্গদেশে মধুর ব্রজবুলির একপ্রকার প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহার আসন খুব উচ্চে।

বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন—

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই। তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই ॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ। তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ ॥
যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ। তঁহি তঁহি কমল পরকাশ ॥
যঁহা লহু হাস সঞ্চার। তঁহি তঁহি অমিয় বিকার ॥
যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ। তঁহি তঁহি মদন শরলাখ ॥

গোবিন্দদাস ঠিক একই ভাবে বলিতেছেন—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণযুগ চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল বন ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে
মুখভয়ে চান্দ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে ॥
ভুজভয়ে পঙ্কে মৃণাল লুকাওল
করভয়ে কিশলয় কাঁপে ॥

গোবিন্দদাস লিখিলেন—

চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার। বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার ॥

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ন্যায় অলঙ্কার-যোগে বহু পদের রসোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই,—যেখানে বিদ্যাপতি অলঙ্কারের শুষ্ক তালিকা রচনা করিয়াছেন, সেখানে অলঙ্কারের সাহায্যে রূপের সহিত গোবিন্দদাস রসেরও উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগঃ—রাই একদিন কালিন্দীর কূলে দেখিলেন কৃষ্ণকে।

কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই ছলিয়া নাগর কান।
ঘরমু যাইতে নারিনু মুই আকুল করিল প্রাণ ॥

প্রথমদর্শনই তাঁহার প্রাণ আকুল করিল। তিনি ধৈর্য্য হারাইলেন।

কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে ॥

সেই দিন হইতে তাঁহার—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে অপর পরসঙ্গ ॥

শ্যামের নাম শুনিলে এখন হইতে তাঁহার "পরাণ উছলে"।

শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ কানুর বচন কানে সে মুরলী বাজে ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগঃ—কৃষ্ণ দেখিলেন সেই একই দিনে রাইকে।

পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা।

ও সেই হইতে তিনি বলেন—

তব ধরি হাম না জানি দিনরাতি।

তাঁহার চোখের নিদ্রা বিগত—

মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি।

দূতী প্রেরণ ঃ—রাইএর দূতী আসিয়া বলিল—

'তোহারি বিরহে ধনি অন্তর জর জর।'
'মরমহি গোই রোই দিন যামিনী গুণি গুণি তুয়া গুণগানা'।
'ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গভঙ্গ তনু মোড়ই কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই গোবিন্দদাস কিয়ে জানি'।।

রাইএর যে কি দুর্দ্দশা! সে এখন শুধু—

আঁচরে মুখশশী গোয়। ঝর ঝর লোচন রোয়।।
কারণ বিনু ক্ষণে হসই। উতপত দীঘ নিশসই।।
তাতল তনু নাহি টুটই। সতত মহীতলে লুঠই।।
কাহক কছু নাহি কহই। কো অছু বেদন সহই।।

এ চিত্রখানি বিদ্যাপতির

চরকি চরকি বহু লোচন লোর।
অধর সুখায়ল নহি নিকষয় বোল।। ইত্যাদি

পদটির মতই সুন্দর।

কৃষ্ণদূতী আসিয়া কহিল—কৃষ্ণের এমন দশা হইয়াছে যে সে—

রা কহি ধা পহু কহই না পারই ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরনী পুনি কো কহ আরতি ওর।।

সেই পুরুষমণি ধরণীতে লুণ্ঠিত, 'রা' বলিতেই চক্ষু দিয়া ধারা বহিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া যায়, 'ধা' আর বলা হয় না।

সে সারারাত্রি জাগিয়া তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকে।

গহন বিরহক লাগি। রজনী পোহায়ই জাগি।।
করতহি তোহারি ধেয়ান। তো বিনে আকুল কান।।

দূতী বলেন—রাই আমার কথায় সন্দেহ করিও না।

সুন্দরী ইথে নাহি কর আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ।।

বিদ্যাপতিতেও আছে—

তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ।

মিলন ঃ—ইহার পর মিলন।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম।।
কনক লতায়ে জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে বিজুরি রসাল।।
কমলে মধুপ জনু পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ'।।
'দুহুঁ রসে ভাসই দুহুঁ অবলম্বই রঙ্গ-তরঙ্গিত অঙ্গ দুঁহু।
নব নাগরী সঙ্গে নাগর-শেখর ভুলল গোবিন্দদাস পঁহু'।।

অভিসার :—হরি অভিসারে চলিলেন রাই। তাঁহার গতি অতি মন্থর। প্রেমপ্রদীপ পথ দেখাইয়া, বর্ষানিশীথের নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়া লইয়া চলিল তাঁহাকে।

'মেঘ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদনদীপ দরশায়ল পন্থ।।
চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার'।।
'ঘর গঞ্জে যব ধনি ভেল বাহার।
দর দর বারি বরিখে অনিবার'।।

অথচ অভিসারে বাহির হইবার ইহাইত প্রশস্ত সময়। গুরুজন-নয়নে আড়াল রচনা করিয়া নীলনিচোলে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া প্রস্থান করার ইহার মত মাহেন্দ্র সুযোগ আর কি হইতে পারে?

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ। নীল নিচোলে ঝাঁপিল মুখচন্দ।।

এমন দিনে বাঞ্ছিতকে পাইবার আকুলতা যে বড়ই দুরন্ত। প্রকৃতির এই দুর্য্যোগময়ী রজনী দূরসংস্থ প্রিয়জনের জন্য প্রিয়াকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। ইহা শুধু poetic convention মাত্র নয়। ইহা প্রেম-জীবনের পরম সত্য। কালিদাস যে বলিয়াছিলেন—মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যথাবৃত্তিঃ চেতঃ। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী জনে কিং পুনঃ দূরসংস্থে।। ইহা তাঁহার গভীর অনুভূতিরই কথা।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের একটা গূঢ় সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক বর্ষার দিনে অধিকতর পরিস্ফুট হয়। আকাশ ও পৃথিবীর এই মিলনোৎসবের দিনে মানবের প্রাণও কি জানি কেন প্রিয়-মিলনের জন্য আকুল হইয়া উঠে। মানব-হৃদয়ের এই নিগূঢ় সত্য নানাভাবে নানা দেশে চিরদিন কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।

মানব-জীবনের সহিত প্রকৃতির এই যে যোগসূত্র বৈষ্ণব কবিকুল ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। বাহ্য প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ে যে এক অখণ্ড মিলনসূত্র গ্রথিত আছে, ইহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের মানসনেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা তাঁহারা সমুদয় বিশ্বের সকল বিকাশকেই একই সার্ব্বজনীন লীলাসিন্ধুর তরঙ্গমালার ন্যায় অঙ্গীভূত ভাবেই দেখিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহাদের রাধা-শ্যামলীলা-কথা রূপকে রচিত হইলেও তাহার কাব্যভাবের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার সংযোগের সহজ অন্তর্নিহিত প্রাণের বাণীও। বিশেষ করিয়া তাঁহাদের রচিত বর্ষা ও বর্ষাভিসারের গানগুলির মধ্যে একথা স্পষ্ট অনুভূত হয়।

বর্ষার দিনে যখন ঝঝা ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া ফিরে, ভুবন ভরিয়া বারিবষণ হয়, শত শত অশনি নিপাত হইতে থাকে, নীপনিকুঞ্জে ময়ূর প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করে, চতুর্দ্দিকে মত্ত দর্দ্দুর, ডাহুক, ডাহুকী কলরোল তুলে, যখন নিবিড় ঘন-কৃষ্ণ মেঘে আকাশ কজ্জলম্লান, তখন মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থলে রহিয়া রহিয়া যে গভীর বিরহ,—কি যেন নাই, কিসের যেন একটা অভাব, এই আকিঞ্চন—অজ্ঞাত রহস্যময় বেদনায় ভরিয়া উঠে। একটা অনির্দ্দিষ্ট অতৃপ্তি, কাহার অভাব-জনিত মর্ম্মপীড়া, কোন্ না পাওয়া পরমাত্মীয়জনের জন্য ব্যাকুলতা ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্ম নিষ্পেষণ করে, তাহাই বৈষ্ণব কবিগণের বর্ষা ও বর্ষাভিসারের চিত্রে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—

শ্রীরাধিকার হৃদয়ের এই যে হাহাকার—ইহাতে যেন রূপ পাইয়াছে নিখিল মানব-হৃদয়েরও চিরন্তন বিরহ-বেদনা।

ঘন মেঘের দুর্দ্দিনে অভিসার-পরিকল্পনা করিয়া তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীতকে যেরূপ উচ্চ গ্রামে তুলিয়াছেন, এমনটি অপর কোনো অভিসারে হয় নাই। তাঁহারা হিমাভিসার, বসন্তাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভিসার, দিবাভিসার, কুজঝটিকাভিসার এইরূপ অভিসারের বৈচিত্র্য কতই দেখাইয়াছেন—সকলগুলিই রসমধুর হইয়াছে, কিন্তু বর্ষাভিসারের ন্যায় সেগুলি মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে নাই।

ইহার প্রধান কারণ বর্ষাভিসারের গানগুলিতে যেরূপ সকরুণ মাধুর্য্য ও ভাবমহিমা বিদ্যমান, সেরূপ অন্যগুলিতে নাই। Shelley বলিয়াছেন Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. সকরুণ চিত্রগুলিই সবচেয়ে বেশী মানবমনকে স্পর্শ করে। ইহা মানবের স্বভাব-ধর্ম্ম।

বৈষ্ণব কবিকুলের বর্ষাভিসারের পদগুলির সকরুণত্ব আরও গাঢ়তর ও নিবিড়তর হইয়াছে তাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় (environments.)। বর্ষার ক্রন্দসী মূর্ত্তি যেন শ্রীরাধিকার অন্তরের বহিঃপ্রকাশ রূপেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য অভিসারের চিত্রগুলি রাধার আত্মহারা ভাবের উপযোগী ও অনুকূল হয় নাই, এবং সেই কারণেই বর্ষাভিসারের ন্যায় তেমন মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে নাই।

বৈষ্ণব কবিগণ বলেন, কষ্টের কষ্টিপাথরে প্রেমের যাচাই না হইলে কৃষ্ণ মিলে না, হরিকে পাইতে হইলে অনেক কষ্ট, অনেক জ্বালাই সহ্য করিতে হয়। সর্ব্বস্বত্যাগ ও আত্মসমর্পণ না করিলে সে বঁধুয়া আপনার হ'ন না, তাঁহাকে

পাইতে হইলে বহু বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়। উপনিষদের ভাষায় এ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত দুরত্যয়। তাই দেখা যায় তাঁহাদের অভিসার-পরিকল্পনায় বিশেষ করিয়া এত বিঘ্নের সমাবেশ। এই সত্যটি বৈষ্ণব কবিগণ বর্ষাভিসারের অভিযান-পথে দুর্গমতার চূড়ান্তের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস তাঁহার রাইকে বলিতেছেন—এ অভিসারে বহুদূরে যাইতে হইবে, সারা পথে বাদর দোল, হে সুন্দরি তোমার অঙ্গের নীলবসন কি এ বারিধারা বারণ করিতে পারিবে?

তহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীলনিচোল।।
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস-সুরধুনী পার।।

সে যে অগম্য স্থান। তাহাতে আবার পথিমধ্যে ঘন ঘন বজ্রনিপাত, চতুর্দ্দিকে বিদ্যুতের দহনজ্বালা। ইহার মধ্যে হে সুন্দরি, যদি গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে অগ্রসর হও প্রেমিকের জন্য, মনে রাখিও দেহ তোমার উপেক্ষিত হইবে।

ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত।।
দশদিশে দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার।।
ইহে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।

প্রেম মানা শুনে না, বাধা বুঝে না কিংবা মানে না। তাই কবির কথায় কর্ণপাত না করিয়া সকল বিঘ্ন বাধা উপেক্ষা করিয়া, সকল প্রত্যূহ অতিক্রম করিয়া রাই, বাঞ্ছিতের উদ্দেশে এহেন দুর্য্যোগের নিশীথে, বিঘ্নসঙ্কুল 'পঙ্কিল, শঙ্কিল' পথে যাত্রা করিলেন—একাকিনী, নিঃশঙ্ক।

কিন্তু গম্যস্থানে এইভাবে পোঁছিয়াও তাঁহার প্রিয়ের সাক্ষাৎ মিলিল না। বিলাপ করিয়া তাই রাই কহেন—

যামিনী আধ অধিক বহি যাওত অবহুঁ না মিলল কান।

কিন্তু প্রিয়কে পাইবার এ হেন আকুল আবেগ যাঁহার, তাঁহার প্রয়াস বিফল হইবার নহে। যিনি এমনি করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, দেহ-প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া, প্রিয়তমের সকাশে অভিসারে গমন করিতে পারেন, তাঁহার প্রিয়-মিলন না হইয়া যায় না। গোবিন্দদাসের রাইএরও অবশেষে কৃষ্ণ মিলিল—

ঐছনে মিলল নাগর পাশ। গোবিন্দদাস কহ পূরন আশ।।

মান ঃ—গোবিন্দদাসের রাইএর মানের চিত্র বিদ্যাপতির অনুরূপ চিত্রের ন্যায়ই অপরূপ। রাই মান করিয়াছেন—কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন—

মানিনী মানে অবনী পর লেখই নয়নে না হেরি শ্যামা।

তিনি যাহা কিছুর বর্ণ শ্যাম, তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন না। বিদ্যাপতির—

অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহ শ্যাম নাম তাহে নহি পেখি।।

ইহার মতই অপূর্ব্ব চিত্র।

তাঁহার রাই মান করিয়া আছেন, কৃষ্ণ দূতী পাঠাইলেন, যাহাতে রাই তাঁহার প্রতি সদয় হন।—

বহুত যতন করি তাহে মানায়বি যৈছে সদয় হোয় রায়।

দূতী "আওল মানিনী পাশ।" কিন্তু ফল কি হইল?

হেরইতে রাই বিমুখ ভৈ বৈঠল।

বিদ্যাপতিতে আছে—

কোপে কমলমুখী পলটি ন হেরল বৈঠলি বিমুখ বিরাগে।

দূতীর চেষ্টা ব্যর্থ হইল। স্বয়ং কৃষ্ণ আসিলেন।

রাইক হৃদয়-ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহ মাধব তবহুঁ বিমুখ ভেল রাই।।

কৃষ্ণ কত মিনতি করিলেন। কিন্তু তবুও রহিল অবিচল রাইএর সেই দুর্জ্জয় অভিমান।

এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহি তবু নাহি হেরল বয়ান।

কৃষ্ণ অনাদরে, উপেক্ষায় মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

রাই অনাদর হেরি রসিকবর অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই পীতবাসে মুছই নয়ান।।

রাইএর এইবার চৈতন্য হইল।

যব নাহি দেখল নাগর কান। দূরহি গেও রোখ সে মান।।

মান তাঁহার দূরে গেল। কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া তিনি বড় কাতরা হইলেন। সখীদের অনুনয় করিলেন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য। বলেন—নতুবা এপ্রাণ আমি কালীদহে বিসর্জ্জন দিব। আমার কৃষ্ণ চাঁদ যদি না ফিরিয়া আইসে, আমি আর এ জীবন রাখিব না।

সখীরা প্রমাদ গণিল। এক সখী ত্বরায় কৃষ্ণকে সংবাদ দিতে গেল। কৃষ্ণ যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন আর অভিমান রাখিতে পারিলেন না।

তাকর সঙ্গে হরি করল পয়ান।

কিন্তু তাঁহাকে দূর হইতে দেখিবামাত্র রাইএর অর্ধবিগলিত অভিমান আবার কঠোর ভাব ধারন করিল।

দূর সঞে নাগরী নাগর হেরি।
বৈঠলি তঁহি পুনঃ আনন ফেরি।।

আর কৃষ্ণ যখন তাঁহার সম্মুখে আসিলেন—

তৈখনে সম্মুখে আওল যব কান।
নাহ হেরিয়া ধনীর বাঢ়ল মান।।

এইরূপই হইয়া থাকে। যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাহারই উপর অভিমান হয়। সে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলে, তখন রুদ্ধ অভিমান অন্তরে গর্জ্জিতে থাকে, আর যখন সে প্রত্যাগমন করে, তখন প্রথম দর্শনে সেই রুদ্ধ অভিমান দ্বিগুণতর হইয়া উঠে। তাহার পর সহসা অশ্রুবন্যায় সব মান অভিমান বিধৌত হইয়া যায়।

যাহা হউক, অবশেষে সখী, কৃষ্ণ ও কবির সমবেত চেষ্টায় রাধার অভিমান উপশান্ত হইল ও অন্তরে নিদারুণ পরিতাপ দেখা দিল।

তুহুঁ সনে মান করল বর মাধব হাম অতি অলপ পরাণ।
রমনীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ তাপে বাঢ়ায়লি অবহুঁ টুটায়ব কেহ।।
সব অপরাধ ক্ষমহ বর মাধব তুয়া পায়ে সোঁপলু পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদগদ হেরইতে রাইক বয়ান।।

বিরহ ঃ—বিরহে গোবিন্দদাসের রাই বিলাপ করিতেছেন—

কোন্ নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহল।।
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুঃখ।
নিশ্চয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ।।

প্রিয়তমের অভাব আর তিনি সহ্য করিতে পারেন না। ইহার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লেখিলেখি।
নয়ন অন্ধুয়া ভেল পিয়া পথ পেখি।।

বিদ্যাপতিতেও আছে—

নখর খোঁয়াওলু দিবস লিখিলিখি।
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ পেখি।।

কিন্তু কই সে পাষাণের ত' দয়া হয় না।

পরাণ পিয়া সখি হামারি পিয়া। অবহুঁ না আওল কুলিশ হিয়া ।।

তিনি বিলাপ করিয়া বলেন—

পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।
সখিহে বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া এই বিধি লিখল করমে ।।

দুঃখ করিতে করিতে তিনি কাতরকণ্ঠে সখীকে জিজ্ঞাসা করেন—

আওবি কানু পুনহি কিয়ে ব্রজধামা পূরব মনোরথ সাধে।

সখী সান্ত্বনা দিয়া বলেন—দুঃখ করিও না রাই-কানু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

দূর কর বিরহিনী দুখ। নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ ।।

কিন্তু সখীর প্রবোধ-বাক্য তাঁহার গভীর শোকের উপশম করিতে পারে না। তিনি অধীর হইয়া আকুল ক্রন্দন করিতে থাকেন। তিনি সরোদনে বলিতে থাকেন, একদিন মান করিয়া যে পুরুষরত্নের কাকূতিমিনতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম—

যাকর চরণ-নখরুচি হেরইতে মুরছয়ে কত কোটী কাম।
সে মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ে পালটি না হেরল হাম ।।

এমনও দিন গিয়াছে, আর আজ সেই রমণী, আমি কাকূতি-মিনতি করিতেছি তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য—কিন্তু বৃথাই। এত দিনেও তিনি ফিরিলেন না। এমন কি একটা সংবাদও পাই না তাঁহার।

এতেক দিবস হইল প্রাণ নাথ না আইল
কাক-মুখে না পাই সংবাদ।

তবে আর এ হেন অবজ্ঞাত জীবন রাখিয়া লাভ কি? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—সে প্রিয় যদি শীঘ্র ফিরিয়া না আসে, তবে আমি এ প্রাণ বসর্জ্জন দিব।

এ কথায় সখীরা প্রমাদ গণিল। একজন ত্বরায় রওনা হইয়া মথুরায় কৃষ্ণকে সংবাদ দিল! বলিল —রাই তোমার বিহনে—

"অতিশয় দূররি ভেল।" "দশমীক পহিল দশা।"

হইয়াছে তার। বিদ্যাপতিতেও আছে—

"দেহ দীপতি গেল।"
"নবমীক দশা গেলি কালি রজনী অবসানে।"

দূতী বলিল—সেই সুন্দরী গোরী সর্ব্বক্ষণ অচেতন হইয়া থাকে। চেতন হইলেও তার মুখে অন্য কথা থাকে না—

"গদ গদ কহে শ্যাম শ্যাম।"
"হরি হরি বলি মুরছি নহী লুটই।"

চেতন অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ তোমারই চিন্তা করে, তোমার বর্ণ-সাদৃশ্য যাহাতে দেখে, তাহারই পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে।

হরিমণি হেরি সঘনে জল খলই।

তোমার বিহনে আজ সকল প্রিয় বস্তুই তাহার নিকট মন্দ হইয়াছে।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল, কোকিল কিল, বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল, চন্দন কন্দন, মারুত মারত ধাব॥
কতয়ে আরাধব মাধব, তোহে বিনু বাধাময়ি ভেল রাধা॥

হে কৃষ্ণ, আমার কথায় যদি তোমার প্রতীতি না জন্মে, চল আমার সঙ্গে নিজ চক্ষে সকলি দেখিবে।

ইহ সব আন লহ যাই দেখহ মঝু সাথ।

সে বরনারী শুধু তোমাকে একবার দেখার আশায় বাঁচিয়া আছে এখনও। সে সর্ব্বক্ষণ তোমার নাম জপ করে কিন্তু, তাহাও বুঝি আর সম্ভব হইবে না।

জীবইতে যুবতী জপই তুয়া নাম।

দূতীর বাক্যে কৃষ্ণের দুটি আঁখি ছলছল করিতে লাগিল।

ছল ছল লোচন পানি।

তিনি কাতর কণ্ঠে দূতীকে বলিলেন—

"হুঁ পরবোধবি রাইক সজনী। যৈছন জীবয়ে দু এক রজনী"॥
"দু এক দিবস মাঝে হাম যায়ব।"

আশ্বাস পাইয়া দূতী ফিরিয়া গেল।

বিদ্যাপতির ভাবধারা বিরহ-চিত্রাঙ্কনে যেরূপ প্রদীপ্ত, নির্ম্মল এবং প্রগাঢ় হইয়াছে, গোবিন্দদাসে ততটা দেখি না। গোবিন্দদাস কৌশল-চাতুরীর দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন।

তাঁহার পদগুলিতে অলঙ্কারের শিঞ্জন, ছন্দের ঝঙ্কার, বাক্যবিন্যাসের মনোহারিতার তুলনায় ভাবের মহত্ত্ব, বিরাটত্ব ও গভীরতা অল্প।

বিদ্যাপতির পদে ভাব, ভাষা, ছন্দ ও সুর সমানভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া চরম সার্থকতায় পৌঁছিয়াছে। গোবিন্দদাসের ভাষা, ছন্দ ও সুরের সহিত ভাবের গাঢ়তা সমানতালে প্রগতিলাভ করে নাই। অনুপ্রাস, শ্লেষ ও নানা বিচিত্র

অলঙ্কার-প্রয়োগে তিনি বিদ্যাপতি অপেক্ষা চমকের সৃষ্টি করিলেও তাঁহার মত রসের সঞ্চার করিতে পারেন নাই।

পুনর্মিলন—পুনর্মিলনেও বিদ্যাপতির পদে ভাব, ভাষা ও কবিত্ব যেমন সমানতালে মহোল্লাসে নর্ত্তন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, গোবিন্দদাসে তেমনটি হয় নাই। তাঁহার রাইও উল্লসিত হইয়াছেন প্রিয় আসিবেন শুনিয়া, কিন্তু বিদ্যাপতির রাইএর মত প্রিয়-আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা বা আত্মবিস্মৃত হইয়া যান নাই।

গোবিন্দদাসের রাইও কহিতেছেন—

আজু মোর শুভদিন ভেল।

তিনিও বলেন—

মঙ্গল কলস' পর দেই নব পল্লব

কারণ আজি—

প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘর আওব।

আমার প্রাণের হরি নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তবু মনে হয় যেন ইহাতে বিদ্যাপতির রাধিকার মত সে উল্লাস, সে বিশ্ববিস্মরণ ভাবোচ্ছ্বাস নাই।

তারপর সকলকে আনন্দে আকুল করিয়া, পশুপক্ষী বৃক্ষলতাকে সঞ্জীবিত করিয়া, ব্রজরমণীগণের দেহমনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, রাধার প্রাণস্বরূপ বরমাধব ভাব-ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন।

দ্রুম পশু পাখী কুল, পরম বেয়াকুল পাওল আনন্দ পুঞ্জে।
বরজ নারীগণ পাওল পরাণ।

শ্রীরাধিকার হৃদয়কুঞ্জে শ্রীমাধব মিলিল।

তখন শরৎকাল। চাঁদিনী রাতি। ফুল্ল জ্যোৎস্না। নিকুঞ্জ ভরিয়া গিয়াছে প্রস্ফুটিত কুসুম-গন্ধে।

"শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লী মালতী যূথী মত্ত মধুপ ভোরনী।"

এমন শারদ সৌন্দর্য্যে ভরা উৎসবের দিনে গোবিন্দদাসের শ্রীরাধামাধবের যুগল মিলন হইল।

ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠান। ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধা মাধব মেলি। মূরতি মদন রসকেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যূথী রসাল॥
ও নব পদুমিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখচাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

সকল বৈষ্ণব কাব্যে বিরহের পর পুনর্মিলন চিত্র দেখা যায়। কিন্তু বৃন্দাবন-লীলা সমাপ্ত করিয়া মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। তবে ইহা সম্ভব হইল কি করিয়া ?

গভীর বিরহে তন্ময় ও তদ্‌গত হইয়া রাধা ভাবিতেন, তাঁহাদের পুনর্মিলন হইল। বিরহ তাপে তাঁহার যৌন বাসনা দগ্ধ হইয়া নিষ্কাম প্রেমের উদয় হইয়াছিল। তিনি মহাভাবে মগ্ন হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। ইহাই দেহাতীত সম্মিলন—নিষ্কাম প্রণয়ের আধ্যাত্মিক মিলন। ইহাকেই বৈষ্ণব কবিরা পুনর্মিলন বা ভাবসম্মিলন বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া কবিদের অন্য যুক্তিও আছে। বর্ত্তমান কবির কথায়—

গৃহ সংসার ছাড়ি যেই পাগলিনী নারী
বেণুতানে ছুটে গেল ভুলি গৃহকর্ম্ম,
কুলশীল লাজ ভয় সকলি করিল জয়
নিছনি দিল যে পায় নিজ নারী ধর্ম্ম ;
মানিল না বন্ধন মানিল না গুরুজন
মানিল না সমাজের পরিবাদ-দণ্ড,
ভূধর-শিখর হ'তে প্রপাত-ধারার স্রোতে
ছুটে গেল প্রেম যার এমনি প্রচণ্ড,
কণ্টকরাজি গাড়ি অঙ্গনে যেই নারী
ঘটজলে পিচ্ছিল করি করে শিক্ষা,
আপনার আঙিনাতে কেমনে শ্রাবণ রাতে
বনপথে অভিসার—পরম তিতিক্ষা।
মানিল না আঁধিয়ার বরষার বারিধার
বজ্রের হুঙ্কার করিল না গণ্য,
ফণীরে দলিয়া পায় পৌষের শীত বায়
কাঁপিল না, ছুটে গেল দয়িতের জন্য ;
তারে ভুলি শ্যাম রায় রাজা হয়ে মথুরায়
বীর-গৌরবে রবে ভোগসুখে মত্ত।
ভুলিবে না এতে ভবী, মানিবে না ইহা কবি,
পুরাণ বলুক কথা—ইহা সত্য নয়।

ভক্তি বা প্রেমমার্গের কথা আমরা নারদীয় পঞ্চদশী ও ভাগবতে পাই। সেখানে ভগবানের নিত্যলীলার কথা বর্ণিত আছে। তাহারই বাণীরূপ আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায়।

ভাগবত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র প্রেমভক্তি। আমরা বৈষ্ণব কাব্যে ইহার চরম অনুশীলন দেখিতে পাই। তাঁহাদের রাই এই প্রেমভক্তির জ্বলন্ত মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি একেবারে কৃষ্ণময়ী হইয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের

সহিত অভেদাত্মিকা। কৃষ্ণ-রাধার যে এই দেহভেদ তাহা শুধু এই মধুর রস-আস্বাদনের নিমিত্ত।

> রাধাকৃষ্ণ যৈছে সদা একই স্বরূপ।
> লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।

তাঁহাদের কাব্যে আমরা দেখি, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি কানু হইয়া বৃন্দাবনে বেণু হস্তে এত রসময় রূপ ধরিয়াছেন।

দুঃখানলে মায়াজাল ভস্মীভূত হইলে জীব ঈশ্বরমুখী হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবিগণ বিরহানলে তাঁহাদের মলিনতা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বক্ষণের জপমালা হইয়াছেন। অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায় তিনি যেন কৃষ্ণের নিজস্ব প্রকৃতি পাইয়াছেন। প্রেমপথের পথিকের ইহাই মুক্তি। আনন্দময়ের আনন্দে বিভোর হইয়া, ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া "তত্ত্বমসি" উপলব্ধি করা এবং মৃগমদ ও তাহার গন্ধ, অগ্নি ও তাহার জ্বালা যেমন অবিচ্ছেদ থাকিয়াও পৃথক, তেমনি ভাবে ভগবৎ প্রেমরস আস্বাদন করা একই কথা।

চিত্ত যখন মধুর নিষ্কাম ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়, তখনকার সেই চরম আনন্দ প্রাপ্তির লীলাকেই রসশাস্ত্রকারেরা রাসলীলা বলেন।

তাঁহাদের কাব্যের রাধার চিত্ত পুনর্মিলনে এই দেহাতীত মহাভাবে ভরপুর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিরমিলন—নিত্য ভাবসম্মিলন। ইহাতে আমিত্বের বা দেবাত্মবাদের লেশমাত্র নাই। নিজসুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান—ইহাকেই বলে মহাপ্রেম।

বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র রূপ ও রসকে মিলাইয়া তত্ত্বকে পরিমূর্ত্তি দিয়াছে। এই সৃষ্টি রচনার চতুর্থ স্তরে যে শ্যাম ও পীত জ্যোতির্ধারার মিলন-স্পন্দনজ্ঞান সাধকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই তাঁহারা রূপকভাবে রূপ ও রসের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ ও রাধার যুগলরূপ আখ্যা দিয়াছেন। তাই কৃষ্ণের বর্ণ শ্যাম ও রাধার বর্ণ পীত। এই পীত জ্যোতির্ধারাকেই উপনিষদ হৈমবতী "উমা" বলিয়াছে, বৈষ্ণব শাস্ত্র "হ্লাদিনী শক্তি" বলিয়াছে। শ্যামজ্যোতিকে বেষ্টন করিয়া পীত-জ্যোতি চক্রাবর্ত্তবৎ প্রতিভাত হয়। শ্যামজ্যোতিকে ঘিরিয়া পীতজ্যোতির এই যে আবর্ত্তন ইহাই রাসচক্রের নর্ত্তন।

বৈষ্ণবশাস্ত্র এই পীতধারাকে "গোপী" ও শ্যাম জ্যোতির্ধারাকে "রাসেশ্বর" বলিয়াছে, এবং ইহাতে যে মহাধ্বনি উত্থিত হয় তাহাই শ্যামের "বংশীধ্বনি"। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই স্থানকেই "রাসমণ্ডল বা নিত্য বৃন্দাবন" বলিয়াছেন। শাক্তেরা ইহাকেই "সহস্রারস্থ মহাপদ্ম" বলেন। এই স্থানই আনন্দদেশ,

ভক্তিশাস্ত্র-কথিত প্রেমময় ধাম—বেদ প্রতিপাদিত সপ্তব্যাহৃতির চতুর্থ ব্যাহৃতিমহালোক।

ঋষিরা সৃষ্টি-রচনায় সাতটি স্তর পরিকল্পনা করিয়াছেন। মলিনমায়া, শুদ্ধমায়া, মুক্তদেশ, আনন্দদেশ, সত্যদেশ, চিন্ময়দেশ ও নিত্যদেশ। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহোলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। ব্রহ্মাণ্ডের মত মানব-শরীরেও এই স্তরভাগ বর্ত্তমান। সুতরাং আনন্দদেশ বা নিত্য বৃন্দাবন মানবের নিজের মধ্যেও অবস্থিত।

বৈষ্ণব সাধক কবিকুল এই মনোবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাদর্শন করিয়া ধন্য হইতেন। এই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নাই,—বৃন্দাবন-মথুরা ভেদ নাই। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।"—রসশাস্ত্রকারের এই বাণীর এই অর্থেই সার্থকতা। এই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ পুনর্মিলন বা ভাবসম্মিলনের রসচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিরহটা মায়া মাত্র। রসসৃষ্টির জন্য ও পরম তত্ত্বের একটা মানবিক বা লৌকিক ব্যাখ্যা (Interpretation) দেওয়ার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ এই মায়াকেই একটা সত্য রূপ দান করিয়াছেন।

অন্তর যখন চরম ভক্তি বা প্রেমে পরিপূর্ণ হয় তখন বিরহটা মায়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন সব সময় প্রিয়ের সাথে মিলন হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি আসে।

নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—পরমপুরুষে পরমপ্রেমরূপ আনুরক্তিই ভক্তি। নারদ ভগবানের প্রতি এই প্রেমকে পরমপ্রেম বলিয়াছেন। এই পরমপ্রেমই অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ। বাক্য, ভাষা এই শুদ্ধা প্রেমকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই সুগভীর নিবিড় প্রেম সাধকের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উপলব্ধ হয়। ইহাকেই নারদ "অমৃতরূপা" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই অবস্থা আসিলে বিরহ দূর হইয়া যায়, তাহাকে মায়া বলিয়া মনে হয়, তখন সদাই প্রিয়ের সহিত মধুমিলন, নিত্যমিলন। তখন বৃন্দাবন, মথুরা ভেদ থাকেনা।

জ্ঞানদাস

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চণ্ডীদাসে যাহা আছে অপর কোনো বৈষ্ণব কবিতে তাহা নাই। একমাত্র জ্ঞানদাসে তাঁহার অনুসরণের চেষ্টা আছে। তাহাও সর্ব্বত্র নহে, তিনি বিদ্যাপতিকেও অনুসরণ করিয়াছেন বহুস্থলে। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই প্রেমাতুর হইয়া পড়েন—

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।

আর জ্ঞানদাসের রাধা স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনুঁ যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই।

বিদেশী সাহিত্যে Love at first sight এর চিত্র আছে। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের রাই সেইরূপ প্রথম দর্শনেই কৃষ্ণের প্রেমে পাগলিনী হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রেমিকের নাম শুনিয়া বা স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়া প্রেম-সঞ্চারের চিত্র অন্য কোন দেশের সাহিত্যে আছে কিনা বলিতে পারি না। চণ্ডীদাসে ও জ্ঞানদাসে আমরা সেরূপ চিত্র পাই।

চণ্ডীদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসের অধিকাংশ পদ সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে লিখিত। তবে চণ্ডীদাসের চেয়ে তিনি অধিকতর অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ—

অপরূপ রূপসী রাই—যাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

ঢল ঢল কষিত কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরি॥

একদিন

সরস সিনান সমাপয়ি

গমন করিতেছেন।

চললি হরিণ নয়নী রাই। ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥

সেই সময় কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিলেন। রাই সহচরীকে তিনি জিজ্ঞাসা করায়

এ ধনিকে অনুপামা

উত্তর আসিল—

বৃকভানু-কিশোরী

যেইমাত্র এই নাম তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তাঁহার হৃদয় প্রেমে অবশ হইল।

শুনইতে নাম প্রেমে পরিপূরল।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ ঃ

জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা বলিতেছেন—

স্বপনে দেখিনুঁ যে শ্যামলবরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই।

তারপর এক দিন স্নান-প্রত্যাগতা অবস্থায় পথিমধ্যে তিনি কৃষ্ণকে দেখিলেন। সে কি রূপ!

শ্যাম চিকনিয়া দে রসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।
ভুবন বিজিত ঠাম দেখিয়ে কাঁপয়ে কাম
কান্দে কত কুলের রমণী॥

এ রূপের তুলনা নাই। সেই হইতে তাঁহার—

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥

এ হেন রূপ দেখিয়া কি জাতি-কুল বজায় রাখা সম্ভব?

কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা॥

তিনি বলেন ইহাতে কিন্তু অপযশ হইবে। তাহা হউক, দুঃখ নাই।

ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা নিছিয়া লইনু মাথে।

তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য অপযশ মাথা পাতিয়া লইতেও কুণ্ঠিত নহেন। ওই নয়ন-ভুলানো রূপ যে তাহাকে পাগল করিয়াছে। ওই চাঁদমুখের জন্য তিনি সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বলেন,—কিসের লোকভয়?

সজনি কি আর লোকের ভয়?
ওচাঁদ বয়ানে নয়ন ভুলালো আর মনে নাহি লয়॥
অযশ ঘোষণা যাক্ দেশে দেশে সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম রাঙ্গাপায় এ তনু সঁপেছি তিল তুলসীদল দিয়া॥
কি মোর সরম ঘর ব্যবহার তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কয় এ তনু নিছিনু শ্যামের ও রাঙ্গাপায়॥

দূতী-প্রেরণ ঃ—

মাধবের দূতী আসিয়া বলিল—

শুন শুন গুণবতী রাই। তো বিনু আকুল কানাই।।
ক্ষীণ তনু মদন হুতাশে।
নিঝরে ঝরয়ে দুই আঁখি।।

রাইএর দূতী আসিয়া বলিল—

মাধব তুয়া অনুরাগিনী রাধা।

তোমার কথা কহিতে গেলে সে—

প্রেম-জলে ভরল নয়ানে।

মিলন ঃ—

চণ্ডীদাসের মিলন-গানের চেয়েও জ্ঞানদাসের মিলন-গান যেন চমৎকার।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক। বয়ানে বয়ানে বহু আরতি অনেক।।

চণ্ডীদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসের রাই চাহিতেছেন, তাঁহাদের দুটি জীবনকে এক করিতে। দেহ যে ব্যবধান রচনা করে, তাহাও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলেন—

না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল ভিন ভিন করি দেহ।।

দেহের চন্দন-চর্চ্চাও তিনি চাহেন না।

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া রাইয়ের দোসর সদাই ফিরয়ে সঙ্গে।।

তিনি চাহেন সুনিবিড় মিলন,—প্রিয়তমের সহিত মিশিয়া একাঙ্গীভূত হইতে। শ্যামকে কোলে পাইয়াও তাঁহার মনে হয় যেন দূর—কত দূর। ইহার চেয়েও নিকটে পাইতে হইবে,—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। তিনি সর্ব্বদাই মুখে শ্যামনাম জপ করেন, কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করেন বারবার, আঁচলে ঘাম মুছাইয়া দেন, প্রেমপরিচর্য্যার অন্ত নাই।

তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞি সদা লয়ে নাম।

তিনি সখীকে বলেন—সইলো অনুরাগবহ্নি আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

সইলো কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বলকি বলিতে পার যত মনে উঠে।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরিতের সার।।
গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে।।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।।
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি।।

প্রেমের এই যে অসীম ব্যাকুলতা, পাইয়াও না পাওয়ার প্রগাঢ় অতৃপ্তি, রূপ-সুধাপানের আকুল আকাঙক্ষা, স্পর্শ পাইবার ব্যাকুল পিপাসা, দেহের সহিত দেহের, হিয়ার সহিত হিয়ার, প্রাণের সহিত প্রাণের মিলনের এই যে দুরন্ত আবেগ, এই যে অন্তরের, চিরজাগ্রৎ বুভুক্ষা (Eternal Yearning) ইহা যেন মর-জগতের নহে, বহু উর্দ্ধে অমৃতলোকে ইহার অবস্থিতি।

এখানে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতি-পথে পরশ না গেল।।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেলি।।

পদটির কথা মনে পড়ে। পার্থিব প্রেমে পদে পদে ক্লান্তি, ক্ষণে ক্ষণে অবসাদ। কিন্তু এ প্রেমে ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। ইহা "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

এই পদাবলী-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার মিলনচিত্রে মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য ও রস-গভীরতার কথা ভাবিতে গেলে একটি কথা মনে পড়ে। একমাত্র চণ্ডীদাস ছাড়া প্রথম মিলনে সকল কবিরই রাধার আমিত্ব পরিস্ফুট। 'আত্মপ্রীতি-ইচ্ছা' অল্পবিস্তর বিদ্যমান।

পুনর্মিলনে 'কৃষ্ণপ্রীতি ইচ্ছা' (কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়) ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। বিরহাগ্নি শ্রীরাধার কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, মান অভিমান সকলি ভস্মীভূত করিয়াছে।

জ্ঞানদাসের পদে আমরা দেখিতে পাই—মিলনের মধ্যে আমিত্ব বিসর্জ্জনের জন্য পরম ব্যাকুলতা। মিলনের গানগুলিও বিরহের রসে সকরুণ।

মিলনোচ্ছাস—

চণ্ডীদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসের মিলনোচ্ছাসগুলি অমৃত রসের উৎস। আত্মহারা শ্রীরাধিকার প্রেমেরআরতি যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহাতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা নাই। বিদ্যাপতির মত ইহাতে চাতুর্য্যের অথবা গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য এইগুলিতে নাই।

জ্ঞানদাস বলেন—

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লৈয়া রাখি বুকে॥"
"তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার।
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার॥"

* * *

"ওহে নাথ কি দিব তোমারে।
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি"॥

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি এই কথা চণ্ডীদাসেও আছে।

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যেধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

জ্ঞানদাসের কৃষ্ণের রাধাপ্রেমে আত্মহারা ভাবটুকুও চণ্ডীদাসেরই মত। কৃষ্ণ বলেন—

সুন্দরি আমারে বলিছ কি?
তোমারি পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন সদা উচাটন সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশদিশগণে তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া গিরিনদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে সদাই জাগয়ে মনে॥

এখানে চণ্ডীদাসের

গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা রাধাময় সব দেখি।
নয়নেতে রাধা গমনেও রাধা রাধাময় হোল আঁখি॥

পদটির কথা স্মরণ হয়।

জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের মত বিশ্বময় রাধার মূর্ত্তি দেখেন। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ বলেন—

তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনা দশদিক হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরি নাম॥
তোমার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলি শিখিলাম॥

০

চণ্ডীদাসের এই ভাবের পদ—

রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥

মুরলী বা বংশী ঃ—

এখানে মুরলী সম্বন্ধে দুএক কথা বলিতে চাই। তত্ত্বের দিক হইতে বৈষ্ণব-কবিকুলের এই মুরলী বা বংশী তাঁহাদের বর্ণিত প্রকৃতির ন্যায় রূপকের ছায়ায় পরিকল্পিত। এই মুরলীরবের তাৎপর্য্য ভগবানের ভক্তকে নিকটে আহ্বান করিবার আমন্ত্রণী ধ্বনি। সেই সুললিত স্বর-লহরী, সেই প্রণব-নাদিনী বংশী ভক্তের সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ ঘুচাইয়া তাঁহাকে মহাআকর্ষণে কৃষ্ণ সন্নিকটে লইয়া যায়। এই বেণুরবের দ্বারা ভগবানের আকর্ষণী Symbolised হইয়াছে।

রাসের নিশীথে এই বংশীরব শুনিয়াই ব্রজের গোপীগণ যিনি যে কাজে ছিলেন, তিনি সেই কাজ সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া মুহূর্ত্তে সংসারের সহিত আত্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মুরলী যেন সজীব পদার্থ। ইহার প্রতিরন্ধ্রের স্বর যেন বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মের এক একটি ধর্ম্মের ধ্বনি-রূপ। ইহার প্রতাপ ও ক্ষমতা অপরিসীম।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সুঙ্কটে। (চণ্ডীদাস)
হাঁরে সখী কি দারুণ বাঁশী
যাচিয়া যৌবন দিয়া হ'নু শ্যামের দাসী। (চণ্ডীদাস)

এই বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক-একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

কোন রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লয় চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফোটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥ (জ্ঞানদাস)

জ্ঞানদাস বলেন,—এ বাঁশী যেমন-তেমন ভাবে বাজে না। ইহা বাজাইবারও বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে।

চরণে চরণ রাখ কদম্ব-হেলনে থাক
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে। (জ্ঞানদাস)

এই বংশী বা মুরলীর একটা বিশিষ্ট নিজস্ব সত্তা আছে। ইহার নিজস্ব ভঙ্গিমা আছে।

অভিসার—অভিসার ও মানের চিত্রে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসকে অনুসরণ না করিয়া বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন।

গগনে ঘনঘটা, সেই বিঘ্নসঙ্কুল পথ, সেই নির্জ্জন নিশীথে প্রিয়তমের উদ্দেশে যাত্রা।

"মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥"

সেই নিঃশঙ্কচিত্ত অভিযান।

ঘন আন্ধিয়ার ভুজগভয় কত শত তবু নহ মানয়ে ভীত।

এত করিয়া কুঞ্জে উপনীত হইয়াও কৃষ্ণ মিলিল না। অতএব কবি স্বয়ং কৃষ্ণ সন্ধানে রাইকে লইয়া চলিলেন।

না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগররাজ॥

এবং তাঁহার চেষ্টায় রাইএর কৃষ্ণ-মিলন।

শ্যামকোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ-মাধুরী॥

মান—চণ্ডীদাসের রাই শত দুঃখ-কষ্টেও কখনও কানুর দোষ দেন নাই। তাঁহার রাই কানুর প্রতি ভুলিয়াও ক্রোধ বা শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার অভিমানের সুর খুব কোমল, তাহাতে মমতা মাখানো, স্নেহ করুণার বাণীরই প্রাধান্য,—এসব কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু অপর বৈষ্ণব কবিগণের এমন কি জ্ঞানদাসের রাইও কৃষ্ণের প্রতি যথেষ্ট বামা হইয়াছেন, দাক্ষিণ্য সংবরণ করিয়া প্রচুর শ্লেষকথা বর্ষণ করিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের মানিনী রাই বিলাপ করিয়া কহিতেছেন—

চন্দন তরু বলি বিখ তরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥

বিদ্যাপতির পদে আছে—

চন্দন ভরমে সিমর আলিঙ্গন খালি রহল হিয় কাঁটে।

জ্ঞানদাসের রাই বলেন—

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুম কিয়ে গাঁথই মাল॥

বিদ্যাপতির রাইও বলিয়াছেন—

বাসি কুসুম কিয় গাঁথয়ে মাল।

জ্ঞানদাসের রাই কহেন—কৃষ্ণ অতি কপট—তাহার অন্তর বাহিরের রীত সমান নহে।

অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈলনহ গাঢ় পিরিত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥

শেষের দুই পংক্তি অবিকল বিদ্যাপতিতে আছে।

কৃষ্ণের প্রতি জ্ঞানদাসের রাই বামা হইয়া বলিতেছেন—

ভাল ভেল অলপে করল সমাধান।
পূরবক পুণ্যফলে পায়নু পরাণ॥

দূতী আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—আপন জনের প্রতি কি এত মান করিতে আছে? মানিনি, মান ত্যাগ কর। কিন্তু দূতীর সকল অনুনয় বৃথা হইল।

হোই নৈরাশতব সখী চলি গেল।

কৃষ্ণচন্দ্র রাইএর দুর্জ্জয় অভিমানের কথা শুনিয়া নিরাশ হইলেন। রাইকে আর আপন করিয়া পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি দিনরাত কেবলি রোদন করিতে লাগিলেন।

না মিলল সুন্দরী শুনি তৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশিদিন।।

এ ছাড়া তাঁহার উপায় কি? তিনি যে স্থির থাকিতে পারেন না। রাধাপ্রেমে তিনি এমনি আত্মহারা যে একমুহূর্ত্তও রাই ছাড়া তাঁহার চলে না। কৃষ্ণের কাছে রাই যে—

"জপতপ তুহুঁ সকলি আমার করের মোহন বেণু।"
"দেহ গেহ সার সকলি আমার তুমি সে নয়নের তারা।
আধতিল আমি তোমা না দেখিলে সব বাসি আন্ধিয়ারা।"

যে ধনি আধতিল চোখের আড়াল হইলে শ্যামের সব শূন্য, সব অন্ধকারময় হয়, তাঁহাকে হারাইলে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবেন তিনি? তিনি শত প্রকারে কাকুতি করিয়া স্বয়ং রাইকে বলেন—

"এধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তোহারি পিরিতি মোর জীবন রহয়।"
"রামাহে ক্ষম অপরাধ মোর।
মদন বেদন না যায় সহন শরণ লইনু তোর।"
"চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতুলি।।"

কিন্তু এততেও ফল হইল না।

কোপে কমলমুখী নয়নে না হেরসি অভিমানে অবনত মাথ।

এততেও যখন হইল না, কৃষ্ণ তখন শেষ চেষ্টা করিতে গেলেন। তিনি এইবার রাইএর অঞ্চল ধরিয়া অনুনয় করিতে গেলেন, কিন্তু—

অনুনয় করতেই অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী।।
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই কমল পদ আধ পয়ান।।

অভিমানিনীর কি অপূর্ব্ব চিত্র! ইহা যেন ছায়াচিত্রের ছবির মত চলনশীল।

বিরহ—বিরহে জ্ঞানদাসের রাই বলেন—

পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাওল দিবস লখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল বরিখে বরিখ কত ভেল।

হে প্রিয় সখা—তবু তুমি আসিলে না। তুমি আসিবে, তুমি আসিবে, এই বলিয়া মনকে আর কত প্রবোধ দিব!

আওব করি করি কত পরবোধব অব জীব ধরই না পার।
জীবন মরণ অচেতন চেতন নিতি নিতি পেল তনুভার।।
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব জীবন গোঙায়ব তব কি করিব জ্ঞানদাস।।

তাঁহার সকল আশা-ভরসা আজ যেন নির্ম্মূল। তিনি হতাশ হইয়া বলেন—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর করমে লেখি।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে পিরিতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে।

চণ্ডীদাসের রাই কৃষ্ণকে ভুলিতে চাহিয়াও ভুলিতে পারেন নাই।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।

জ্ঞানদাসের রাইও কৃষ্ণকে ভুলিতে পারিতেছেন না।

তবু সে বঁধুরে আমি পাসরিতে নারি।।

কানুর বিরহ অসহ্য হইলে চণ্ডীদাসের রাই যেভাবে বলিয়াছিলেন—

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।

জ্ঞানদাসের রাইও তেমনভাবে বলেন—

বঁধুর লাগিয়ে মুঞি হব বনবাসী।

তবে সকল সময় বিরহে জ্ঞানদাসের রাই চণ্ডীদাসের রাইএর মত থাকিতে পারেন নাই। কখন কখন তীব্র শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বিরত হন নাই।

"যখন আমাকে সদয় আছিলা পিরিতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি হইলে বিরাগী নিদয় হইলে দড়।।"
"তোমার পিরিতি দেখিতে শুনিতে যে দুঃখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা তোমার পিরিতি রীতে।।"
"সহজে অবলা অখলা হৃদয় ভুলিনু পরের বোলে।"

আবার অন্যত্র আকূতি-মিনতি করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

পরাণ কাঁদে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া।।

হে প্রভু, তোমার অদর্শনে আমার

ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি।।

তিনি কখন কাতর অনুনয় করিয়া বলেন—আমার বিষয় তোমার কি অজানা আছে প্রভু—তুমি ত' সকলি জান শ্যাম, তুমি ছাড়া আমার যে অন্য গতি নাই।

তোমা বিনা তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই।

আমার গৃহে শাশুড়ী, ননদী, বাহিরে পাড়াপ্রতিবেশী, সকলেই আমার শত্রু, আমি যে ফুকারিয়া কাঁদিব, তাহারও উপায় নাই। আমার অবস্থা চোরের রমণীর মত।

চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহয়ে পাড়াপড়শীর ডরে॥

কত কাল আর কানু আমার এইভাবে যাইবে? আমি এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। এমন করিয়া কেহ কি বাঁচিতে পারে?

কাঁদিতে না পাই বঁধু কাঁদিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদী কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙারিয়া মরি॥

চণ্ডীদাসে আছে—

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহঁ মুই ভোখিমু গরলে॥

জ্ঞানদাসের রাই সখীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

বঁধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা।

তাঁহার তনু দিনদিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—তিনি বলেন—সই তাতে কোন দুঃখ নাই—খুব জোর মরণ আসিবে—সে ত' সই আমার চিরকাম্য। দুঃখ এই শুধু—

পুনঃ নাহি হেরব সো চান্দ বয়ান।

তিনি কখনও আবার চণ্ডীদাসের রাইএর মত যোগিনী সাজিয়া দেশে দেশে ঘুরিতে চাহেন।

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনীবেশ যদি সই পিয়া না আইল।
এ হেন যৌবন পরশ রতন কাচের সমান ভেল।
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি॥

কখন বলেন—

আর না যাইব সই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥

কখন বলেন—

যদি না আইসে বঁধু নিচয় জানিয়।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিয় ॥

এই সব পদে দেখা যায় জ্ঞানীদাসের রাই বিরহে যেন একেবারে পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন। কখনও তীব শ্লেষবাক্য, কখন অনুনয়, কখন ক্রোধ, কখন কাকূতি—কি করিবেন যেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না!

রাইএর এইরূপ বিলাপে স্থির থাকিতে না পারিয়া কবি চলিলেন মথুরায়, সঙ্গে দূতী।

এদিকে রাই—

কানু কানু করি ক্ষিতিতলে মুরছলি।

ত্রস্তে সখিগণ সমস্বরে তাঁহার কর্ণে শ্যামনাম শুনাইতে লাগিল। তখন রাই কমলিনী—

চেতন পাই হেরই দশদিশ অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকারয়ে অবহুঁ না আওল সোই॥
রোয়ত হসত যসত মণি যোজত পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে মথুরা নগরে সিধারি॥

এদিকে জ্ঞানদাস দূতী সহ মথুরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন-- হে মাধব, রাইএর—

সোনার বরণ দেহ। পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর। মুরছে সখীক কোর॥
দারুণ বিরহ জ্বরে। সো ধনি গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ। কহয়ে জ্ঞানদাস।

দূতী কহেন—তুমি অতি নির্দ্দয় কানাই, তোমার হৃদয় পাষাণে গড়া—

শুন শুন নিরদয় কান। তহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ॥

রাই যে তোমার বিহনে বাঁচে না—

তাকর নাহিক আশ। অতয়ে আয়নু তুয়া পাশ॥

তার—

"চৌদশী চাঁদ সমান। মলিনতা ধরল বয়ান।"
"উঠিতে শকতি নাহি তার। জীবন মানয়ে ভার॥"

জ্ঞানদাস বলেন—বলিব কি শ্যাম, রাই যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এমন লোক বোধ করি পৃথিবীতে নাই।

যব তেজই দীঘল নিশাস।
তব দূরে রহ জ্ঞানদাস॥

দূতী বলেন—রাইএর এখন কণ্ঠাগত প্রাণ। সে শুধু তোমার জন্য। হে হরি, এ তোমার কেমন কাজ, জগৎ ভরিয়া চিরতরে যে লজ্জা রহিয়া গেল।

বুঝিয়ে না পারি বয়নক বোল।
কণ্ঠে গতাগতি জীবন হিলোল॥
এ হরি এ হরি জগভরি লাজ।
তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ॥

কবি কহেন—মনে রাখিও, মাধব—

যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধ ভাগী॥

বিদ্যাপতিতেও এই কথা আছে—

অব সেও জীব তেজতি তুয়া লাগি।
তাক মরণ বধ হোয়ব ভাগী॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও অপর বৈষ্ণব কবিগণের সকলের পদেই আমরা দেখিতে পাই রাধা-বিরহের চিত্র একই বর্ণে চিত্রিত। তন্ময়তার কিছু তারতম্য থাকিলেও প্রত্যেকের রাধাই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিরহোন্মাদে কৃষ্ণময়ী হইয়া পড়িয়াছেন। "তন্মনস্কস্তদালাপস্তদ্বিচেষ্টস্তদাত্মিকঃ হইয়াছেন।

কবিদের কাব্যে যে বিরহোন্মাদ চিত্রিত হইয়াছে, ঠিক তাহাই পরিস্ফুট ও পরিমূর্ত্ত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলের জীবনে। আর্য্য ঋষিগণ যে দুস্তর তপস্যার কথা বলিয়াছেন—তাহাকেই বৈষ্ণব ঋষিগণ শ্রীমতীর বিরহে রসময় রূপ দান করিয়াছেন।

পুনর্মিলন—জ্ঞানদাসের রাধার পুনর্মিলন-চিত্র অনেকটা চণ্ডীদাসের রাইএর পুনর্মিলন-চিত্রের মত। বিচ্ছেদের আশঙ্কায় রাধা সদাই সন্ত্রস্ত। প্রিয়-মিলনের পরম সম্ভোগের মধ্যেও প্রাণে বড় ভয়, যদি তিনি আবার শ্যামহারা হন!

"শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ আর না দিব ছাড়িয়া॥"
"যে ছিল আমার মরমের দুখ সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়াল রহিব একই যোগ॥"

চণ্ডীদাসে আছে—

"সই এই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥"

জ্ঞানদাসের রাই বলেন—

বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব।

কারণ, তোমাকে যে আমি--

পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি।

রাই বলেন—প্রেমডোরে ও-রাঙ্গাচরণ দুখানি বাঁধিয়া রাখিব।

প্রেমডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়া দুখানি চরণারবিন্দ।

পুনর্মিলনে জ্ঞানদাসের রাইএর প্রেমভক্তি যেন নিবিড়তম হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তিনি কৃষ্ণপদে কায়মনে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে চাহেন।

কি দিব কি দিব মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।
তুমি যে আমার নাথ আমি যে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার।
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহে ধনি এই সবে সার।

প্রপত্তিরবা শরণাগতিব্য আত্ম-সমর্পণের সহিত সর্ব্বস্ব বলিতে যাহা কিছু সকলই প্রিয়তমের শ্রীচরণে নিবেদন। ইহার চেয়ে বড়, ইহার চেয়ে মহীয়ান্ দান আর কি হইতে পারে?

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" এইখানেই ভক্তি-পথের, প্রেম-পথের পথিকের গন্তব্যস্থান। ইহাতেই তাহার পর্য্যবসান, ভক্তের ভগবানে আত্মসমর্পণ বা বিসর্জ্জন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

—শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা জগতে যে প্রেমধর্ম্মের বীজ বপন করিল, কালে তাহাই ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইল। প্রেমধর্ম্মের সুরধুনী বহিয়া গেল। কত প্রেমিক মহাপুরুষ সেই পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া ধন্য হইল। আসিলেন প্রেমপূজারীর দল বৈষ্ণব-কবিকুল। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, কবিবল্লভ, রায়শেখর কত শত কবি। তাঁহাদের প্রেমধর্ম্মকাব্যের উচ্ছল তরঙ্গ কূলেকূলে রস পরিবেষণ করিয়া বাঙ্গালার মাটিকে শ্যামময় করিল। প্রেম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া সেই

নদীতে মহাবন্যা আনিয়া তাহাতে শুধু 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়' নয় সমগ্র ভারতবর্ষ প্লবমান।

সাধকগণ ও কবিগণ মানস বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের রসলীলা চাক্ষুষ দেখিলেন। সে মিলনলীলা আজিও চলিতেছে, নিত্যকাল ধরিয়া চলিবে। ইহাই নিত্যলীলা। যাঁহাদের সাধনা আছে, যাঁহারা এই লীলা-দর্শনের অধিকারী। আজিও তাঁহারাই ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দেখিতে পান। যাঁহাদের সাধনা নাই তাঁহারা দেখিতে পান না বলিয়া ইহা আজগুবি মনে করেন।

তাঁহাদের মতে বৃন্দাবন-ভূমি চিন্ময়। ভৌগোলিক বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে এমন একটি রসময়ী আবেষ্টনী সৃষ্টি হইয়া আছে যে, যে কোন ভক্ত সেখানে গিয়া এই লীলামাহাত্ম্য অনুধ্যান করিলেই এই চিন্ময় বৃন্দাবনের সন্ধান লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন যে কত বৈষ্ণব সাধক তাঁহাদের দেহ-সমাধি পর আজিও বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

কেহ সখা ভাবে, কেহ বা সখী ভাবে আজিও আমাদের আলোচ্য কবিগণ—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি মনোবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার সহচররূপে বাস করিতেছেন। এই বৃন্দাবনই প্রেমময় পুরুষের প্রেমের ভূমি। ইহার ধুলিবালি গুল্মলতা প্রেমের বিচিত্র বিলাস। এইখানে প্রেমপিপাসু ভগবান প্রেমময়ী গোপিকাগণের পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছিলেন। এখানে তরুলতার বুকে প্রেমপুলক, সুধাধারা। এখানে ময়ূর নাচে, হরিণী নাচে, শুকসারি নাচে, ধেনুগণ প্রেমে আত্মহারা, পাগলপারা। এখানে রাখাল বালকগণ কানুর সখা গোপিগণ সখী, আর শ্রীরাধিকা মহাভাবময়ী কৃষ্ণ-প্রিয়া।

> "বৃন্দাবন দিব্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, মনোহর মন্দির উজ্বল।
> আবৃত কালিন্দী তীরে, রাজহংসী কেলি করে, কুবলয় কণক উৎপল।।
> তার মাঝে হেমপীঠ, অষ্টদল বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
> তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি' আছে দুহুজনে, শ্যামসঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।।"

এই সেই বৃন্দাবন। আনন্দময়ের আনন্দস্বরূপের আনন্দধাম।

এই বৃন্দাবন লোকোত্তর, ইহার রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা লোকোত্তর। এই লীলা কাব্যের দেহটা পর্য্যন্ত লোকোত্তর।

এই বৃন্দাবন লীলা কাব্য মধুর রসের, কিন্তু ইহার মধ্যদিয়া একটা অলৌকিক মহতী কারুণ্যধারা প্রবাহিত। তবে ইহা প্রাকৃত কারুণ্য নয়—অপ্রাকৃত। মানবাত্মার পরমাত্মাকে না পাওয়ার জন্য যে কারুণ্য, ইহা সেই কারুণ্য। মানব জীবনের ইহাই এক নিদারুণ Tragedy.

জীবাত্মা ও পরমাত্মা তথা রাধাকৃষ্ণের এই লোকোত্তর বৃন্দাবন লীলা কাব্যের মাধুর্য্য, সুষমা, সৌকোমার্য্য সাথে সাথে কারুণ্য রসধারা এবং কীর্ত্তন সঙ্গীতের অমর কলতান চিরদিন মানব মনোবৃন্দাবন মুখর করিয়া রাখিবে।

উপসংহার

বিদ্যাপতির অপরূপ উপমাগৌরব, ছন্দের অতুলনীয় ঝঙ্কার, শব্দালঙ্কারের কারুচ্ছটা, মনোমোহন কবিত্ব যেমন চণ্ডীদাসে নাই, তেমনি গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতির কাব্যের বিশিষ্ট গুণগুলি জ্ঞানদাসের কাব্যে নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসে যাহা আছে, যাহা অপর কোনো বৈষ্ণব কবির কাব্যেও পাওয়া যায় না ; তাহা একমাত্র জ্ঞানদাসে অল্প বিস্তর লক্ষিত হয়।

চণ্ডীদাস সহজ ভাষার কবি। কিন্তু সে ভাষায় যে সহজভাব ফুটিয়াছে তাহা অতল-স্পর্শ। সহজভাষায় এমনি ভাবের অতলস্পর্শতা জ্ঞানদাসের কাব্যেও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস সৌন্দর্য্যের কবি, রূপের কবি।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস মাধুর্য্যের কবি, রসের কবি।

বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাস শ্রীরাধিকার সলজ্জচকিত চাহনিটুকু, হিয়ার দুরুদুরু স্পন্দন, অভিসারের শঙ্কিত গমনভঙ্গীর প্রতি রেখাটুকু, প্রেমবৈচিত্র্যের প্রতি উচ্ছ্বাসের রেশ, দুর্জ্জয় অভিমানের অনবনমিত ভঙ্গিমা, বিরহের জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাসের দহন মিলনের বিচিত্র আনন্দময় আবেশটুকুও অপূর্ব্ব তুলিকাপাতে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে চলচ্চিত্রের ছবির মত উপস্থাপিত করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস যেন অতি সহজে এক একটি পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে রস যেন উথলিয়া উঠে। তাহার চিত্র, বর্ণ, ভাব সব যেন মাধুর্য্যে মণ্ডিত। প্রেমের আবেগে তাহা এমনি উচ্ছ্বাসময় যে উপমা, ছন্দ, শব্দ, ধ্বনি, অলঙ্কার কিছুই দেখিবার প্রয়োজন হয় না।

জ্ঞানদাসের পদে এই প্রকারের রস স্থানে স্থানে মনঃপ্রাণ সিক্ত করে। কালিদাসের ন্যায় বিদ্যাপতি চিত্রাঙ্কনী কলায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ন্যায় তিনিও এক একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগে অপরূপ চিত্র ফুটাইয়া তোলেন। কালিদাসের ন্যায় তাঁহার কাব্যের চিত্রশালায় পাঠকের মন শুধু চিত্র হইতে চিত্রে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যে পরিভ্রমণ করে না। অধিকাংশ স্থলে বিহার, বিলাস, বিভ্রম, লাস্য, হাস্য, মদরাগ ও অভিসারের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। কালিদাসের ন্যায় বিদ্যাপতির কাব্য-বর্ণিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। তবে কালিদাসের কল্পনার সে বিরাট বৈচিত্র্য

বিদ্যাপতির কাব্যে পাই না। গোবিন্দদাসের চিত্রগুলি অনেকটা বিদ্যাপতির অনুরূপ। তবে তাঁহার রচনা কালিদাস অপেক্ষা মাঘের রচনার অধিকতর অনুযায়ী। মাঘের রচনার মতই তাঁহার রচনার রস বিশ্লেষণ করিতে ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু এই ক্লেশটুকু স্বীকার করিলে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করা যায়। সে আনন্দ কতকটা aesthetic কতকটা intellectual।

চণ্ডীদাসের কবিতা ভবভূতির ন্যায় আনন্দ, বেদনা, মিলন, বিরহ, সুখ, দুঃখ, হাসি অশ্রু—এসবের অতীত একটা অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে মনকে লইয়া যায়। ভবভূতির কাব্যে সর্ব্বত্র একটা শোকাতীত প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য দৃষ্ট হয়, আর চণ্ডীদাসে দৃষ্ট হয় সকরুণ মাধুর্য্য। ভবভূতির রচনায় পাই আনন্দেও বেদনা, সুখেও দুঃখ, মিলনেও সংশয়, আশঙ্কা, দুঃখেও সুখদুঃখাতীত ভাব, বেদনার মধ্যেও একটা কি জানি কিসের আবেশ ও তন্ময়তা। চণ্ডীদাসেও সেই সব। ভবভূতির ন্যায় চণ্ডীদাসের সুরও "মরমে পশিয়া" তথায় সুখদুঃখাতীত একটা আবেশে গূঢ় ও গাঢ় রসের সৃষ্টি করে।

জ্ঞানদাসের কতকগুলি চিত্র বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের মত, কতকগুলি চণ্ডীদাসের কাছাকাছি। বহিঃসৌন্দর্য্যের বর্ণনায় বিদ্যাপতি একপ্রকার অদ্বিতীয়, গোবিন্দদাস তাঁহার সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনায় দাঁড়াইতে পারেন। বিদ্যাপতির কাব্য-শরীরের লাবণ্য অপূর্ব্ব, গোবিন্দদাস এই লাবণ্যের উপর অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য যোগ দিয়াছেন। অন্তঃ সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কবি জগতেই খুব অল্প আছেন। তাঁহার বিরহ, মাথুর ও পুনর্মিলনের গানগুলি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। চণ্ডীদাসের পদগুলিতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের মত রচনা-চাতুর্য্য নাই, অলঙ্কারের শিঞ্জন নাই, অনুপ্রাসের লালিত্য নাই, চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় ও অতুলনীয় কল্পনায় তাহা অভিরঞ্জিত হইয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহা একেবারে "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিয়া "প্রাণ আকুল" করিয়া দেয়।

জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ এইরূপ মর্ম্ম পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। অনেকস্থলে চণ্ডীদাসের সহিত জ্ঞানদাসের ভাব ও ভাষার কিছু কিছু মিলিলেও চণ্ডীদাসের ভাবের অতলস্পর্শতা জ্ঞানদাসেও নাই। সেইরূপ বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষার সহিত গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষা অনেকটা মিলিলেও বিদ্যাপতির কবিত্বের চমৎকারিত্ব গোবিন্দদাসে নাই। তবে রচনার লালিত্যে, ছন্দের মাধুর্য্যে মাধুর্য্যে ও চাতুর্য্যে, অলঙ্কার-প্রয়োগে, রসসৃষ্টির বহিরঙ্গীয় নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাস—সুখের কবি।

চণ্ডীদাস — সুখদুঃখাতীত কবি।
জ্ঞানদাস — সুখদুঃখের কবি।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বিরহে বড়ই কাতর মিলনে উভয়েরই চরম আনন্দ।

চণ্ডীদাস কি বিরহে কি মিলনে সুখদুঃখ, আনন্দ-বিষাদের অতিরিক্ত বাচ্যাতিশায়িনী ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত করিয়াছেন ; সে ব্যঞ্জনা যেন একটা সুখদুঃখাতীত ভাবাবেশের মগ্নতা।

জ্ঞানদাসের কল্পনা কখনও বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের ন্যায় বিরহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মিলনে উল্লসিত হইয়াছে, কখনও আবার চণ্ডীদাসের ন্যায় মিলনেও বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আত্মহারা হইয়াছে, আবার বিরহে যোগিনী সাজিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়াছে।

চণ্ডীদাস প্রেমের পূজারী। প্রেমে আত্মহারা কবি। প্রেমই তাঁহার নিকট স্বর্গ, অপবর্গ, সর্ব্বস্ব।

চণ্ডীদাসের রচনায় দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ, মিলনে চির অতৃপ্তি, বাঞ্ছিতকে পাইয়াও আরও নিকটে পাইবার, অসীমকে হৃদয়ে ধরিবার একটা আবেগ লক্ষিত হয়।

জ্ঞানদাসের মধ্যেও স্থানে স্থানে ঐরূপ আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রেমমিলনে অসীম অতৃপ্তি দেখা যায়। তবে অধিকাংশ স্থলে তাঁহার মিলনে উৎসব, বিরহে হৃদয়-ভাঙ্গা দুঃখ।

চণ্ডীদাসের রাধাশ্যামের প্রেমমিলনের মধ্যে যেন এক অনির্দ্দেশ্য বিবশতা বিরাজ করে। তাহা সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা দুষ্কর। শ্যামের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার রাধা বিহ্বল হইয়া পড়েন। চৈতন্য লুপ্ত কি প্রবুদ্ধ বোঝা যায় না।

জ্ঞানদাসের রাধাশ্যামের প্রেমমিলনে চণ্ডীদাসের মত গভীরতা না থাকিলেও একমাত্র তাঁহার মধ্যেই আমরা এ ধরণের চিত্র কতকটা দেখিতে পাই। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, চণ্ডীদাসের রাধিকা একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি, তাঁহার রাধিকা কোথাও বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস বা অপর বৈষ্ণব কবিগণের রাধিকার মত প্রখরা-মুখরা নহেন, আবেগময়ী জ্বালায় উদ্দীপিত হইয়াও উঠেন নাই। রাধিকা অনুক্ষণ যেন প্রিয়তমের ধ্যানে তন্ময়। কি মিলন, কি বিরহ, কি সুখ, কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই তাঁহার রাই আত্মহারা।

বিরহে যখন বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের রাই শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় শ্লথবন্ধন হইয়া কাতর বিলাপ করেন, চণ্ডীদাসের রাই তখন প্রিয়তমের চিন্তায় তন্ময়, তখনও আত্মহারা। মনে হয় যেন এক পঞ্চতপা যোগিনী হৃদয়ে অনুরাগবহ্নি জ্বালাইয়া শ্যামসূর্য্যের পানে চাহিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্না।

চণ্ডীদাসের রাধিকা অসীম করুণাময়ী, শান্তা, সুশীলা, প্রেমবিহ্বলা, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসের রাইএর মত অভিমানিনী নহেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রেমসাধিকা। তাঁহার মান যেন শরতের লঘু মেঘ খণ্ড। কোথাও জমাট বাঁধিয়া উঠে না। মান তাঁহার আত্মপ্রতারণা মাত্র। প্রিয়তমকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে গিয়া তিনি নিজেই হৃদয়ে ব্যথা লইয়া ফিরেন। তাঁহার চক্ষে আমরা যে বারিধারা ঝরিতে দেখি, তাহাকে অভিমান অশ্রু বলিয়া মনে হয় না, যেন হৃদয়ই বিগলিত হইয়া নয়ন-পথে দ্বিধারায় ঝরিতেছে বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের শ্রীরাধিকা অভিসার, মান, মিলন, বিরহ সকল অবস্থায় নীলশাড়ী পরিহিতা, বিলাসিনী মূর্ত্তি। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাই কৃষ্ণসন্দর্শনের পর হইতেই সকল সময় ও সকল অবস্থায় "রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।"

জ্ঞানদাসের রাই অধিকাংশ সময়ে নীলশাড়ী পরিলেও কখন কখন রাঙ্গাবাস পরিয়া চণ্ডীদাসের রাইএর মত যোগিনী সাজিয়াছেন।

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের শ্রীরাধিকা নানা ভঙ্গী, নানা ভাব, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একটা ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন হইতেই তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের মলয় হিল্লোলে কম্প্রহৃদয়া চিরকিশোরী এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনে সেই একই আত্মভোলা প্রেমতন্ময়তার ভাব বিদ্যমান।

বিদ্যাপতির রাধা প্রথমভাগে বিলাস-রঙ্গময়ী, সুচতুরা, হাস্যরসিকা, কৌতুকপ্রিয়া, চটুলা, বাক্‌বিদগ্ধা, ছলনাময়ী পুরনারী। প্রেমজীবনের মধ্যভাগে বিরহ-বিধুরা, অচপলা, শিশির-মথিতা পদ্মিনী। শেষভাগে শান্তশ্রীসম্পন্না, মহিমময়ী, ভাবানন্দময়ী, চরিতার্থতার গৌরবে গরবিনী।

গোবিন্দদাসের রাই অনেকাংশে বিদ্যাপতির রাইএর অনুরূপ। চণ্ডীদাসের রাই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধ্যাননিমগ্না, প্রিয়তমের ভাবে আত্মহারা কঠোরা যোগিনী অথচ করুণাময়ী, আবার অসীম বিরহাবেগে বিবশব্যাকুলা, কিন্তু সুখদুঃখাতীত নির্দ্বন্দ্বভাবে বিভোরা। ইহজগতে থাকিয়াও তিনি যেন লোকাতীত।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাদের রাইএর কৃষ্ণ-মিলনের পর যেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের রাধার সব সাধ মিটিয়াছে, সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, সব জ্বালাযন্ত্রণা, সব শোকদুঃখ যেন নির্ব্বাপিত হইয়াছে কান্তের সহিত মিলনে। কৃষ্ণ-সম্মিলনে তাঁহাদের রাইএর সকল বাসনা পূর্ণ হইয়া যেন এক চরম শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাঁহার অন্তরে।

জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাশ্যামের মিলনের পরও আমরা দেখিতে পাই বিচ্ছেদ-শঙ্কা। প্রিয়-মিলনের পরও তাঁহাদের রাইএর প্রাণে বড় ভয়, যদি আবার তিনি শ্যামহারা হন। তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের, রাধাশ্যামের মিলন-চিত্রও যেন একখানি বিরহ-ব্যথারই ছবি। তাঁহার রাধার কৃষ্ণ-মিলন-রস যেন প্রগাঢ় হইয়া বিরহ-রসের মতই হইয়া উঠিয়াছে। মিলনের মধ্যেও এক রহস্যময় বিবশব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় যেন চণ্ডীদাসের রাধাশ্যামের মিলন মিলন নয়; বিরহও বিরহ নয়; মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন যেন ওতপ্রোত।

প্রেম যেখানে যত নিবিড়, ভালবাসা যেখানে যত গভীর, আশঙ্কাও তত সেখানে পদে পদে। চণ্ডীদাসের রাধার প্রিয়কে পাইয়াও যেন তৃপ্তি নাই। প্রেমের অতৃপ্তি রহিয়া যায়। তাঁহার রাধার হৃদয় উৎস হইতে এই অনাবিল অসীম প্রেম-তরঙ্গ যেন দুকূল প্লাবিত করিতেছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বর্ণনায় চণ্ডীদাসের ভাবের মহত্ব, মিলন ও বিরহে আবেগের গভীরতা, অনুরাগের অসীমতা মানব-মনকে এক অতি উচ্চস্তরে লইয়া যায়। তাঁহার কাব্যের সুরতরঙ্গিণী-ধারায় ভাবের অলকানন্দা মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মহিমার স্থষ্টি করিয়াছে। তাঁহার কুঞ্জকুটীর যেন প্রেমযোগীর সাধনার আশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

জ্ঞানদাসের কয়েকটি প্রেমচিত্র চণ্ডীদাসের ন্যায়ই মানব-হৃদয়কে অতি উচ্চ গ্রামে পৌঁছাইয়া দেয়।

বিদ্যাপতির অতুলনীয় কবিত্ব, তাঁহার পুঙখানুপুঙখরূপে বিশ্বসৌন্দর্য-বিশ্লেষণ, তাঁহার মহাকবিসুলভ ভাবপরম্পরা আমাদের হৃদয়-মনকে যেন সম্মোহিত করিয়া তোলে। তাঁহার রস-বৈচিত্র্য, কল্পনার বিস্তৃতি, শব্দকুশলতা মনে এক অপূর্ব্ব আবেশ আনিয়া দেয়। গোবিন্দদাসের অলঙ্কার সাহায্যে রস-স্থষ্টি, তাঁহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণও একটা 'লোকোত্তর-বিচ্ছিত্তির' স্থষ্টি করে।

সৌন্দর্য্যের কবি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বিশ্বসৌন্দর্য্য হইতে তিল তিল করিয়া সুষমা সম্পদ সংগ্রহ করিয়া, বিচিত্র তুলিকাপাতে তাহাতে আপন মনের

মাধুরী মিশাইয়া মানসী প্রতিমাকে শ্রীরাধা-রূপে পরিকল্পিত করিয়াছেন। তাঁহাদের রাই যেন বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা।

মাধুর্য্যের কবি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস বিশ্বের সকল মধুরিমা, সকল রসসার আহরণ করিয়া যেন সরল অনাড়ম্বর সহজ ভঙ্গীতে আপন আপন মনের অগাধ মাধুরী দিয়া তাঁহাদের রাইকে গড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের রাই যেন বিশ্ব-মধুরিমার প্রতিমূর্ত্তি, রসমাধুর্য্যের মহাশ্বেতা। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের সৃষ্টি objective, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের সৃষ্টি subjective।

বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের রাধা রক্তকমলের উপরে অধিষ্ঠিতা রূপলক্ষ্মী--চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের রাধা শ্বেত শতদলে আসীনা রস-সরস্বতী। যেখানে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস প্রেমের মর্ম্মরখচিত অতুলনীয় তাজমহল গঠন করিয়াছেন, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস সেখানে প্রেমের গগনস্পর্শী স্বর্ণদেউল রচনা করিয়া তাহাতে জীবন-দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের প্রেম-মন্দিরের চূড়া আবার মর জগতের ধুলামাটি ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিকুলের রাধা এক অপূর্ব্ব চরিত্র। জগতের কোনো সাহিত্যের কোনো নারীচরিত্রের সহিত ইহার তুলনা হয় না। সাবিত্রী, বেহুলা, সীতা, শকুন্তলা, জুলিয়েট, ডেসডিমোনা, লরা, বিয়াত্রিচে কেহই প্রেমের এত উচ্চ গ্রামে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

বৈষ্ণব কবিকুলের শ্রীরাধা-চিত্রে দেখিতে পাই তিনি যেন সদাই কৃষ্ণকে অনুসরণ করিতেছেন। হ্লাদিনী প্রকৃতি সর্ব্বদা চিরসুন্দরকে পাইবার জন্য যেন অভিসারিকা। শ্রীরাধাই এই প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণ বা পরমপুরুষের হ্লাদিনী শক্তি। বৈষ্ণব কবিগণ এই হ্লাদিনী শক্তির সন্ধান পাইয়াই কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়। হ্লাদিনী শক্তি উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা রাধা-ভাবাপন্ন। তাঁহাদের রাগাত্মিকা প্রেমভক্তিই শ্রীরাধিকার ন্যায় তাঁহাদিগকে হ্লাদিনী প্রকৃতি দান করিয়াছে। ভেদের জগৎ, বিধিনিষেধের জগতের উর্দ্ধে অবস্থিত তাঁহাদের নিজ নিজ মনোবৃন্দাবনে--যেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সকলেরই অবসান হইয়াছিল, যেখানে একমাত্র রাগাত্মিক কৃষ্ণপ্রেমের রাজত্ব, না জানি কবে কোন্ শুভলগ্নে চিরসুন্দর সেখানে আসিয়া রাসোৎসব করিয়া ছিলেন। তাহারই মধুর স্মৃতি পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে। সেদিনও কি গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন-রজনীর ন্যায় শারদীয়া রাত্রি ছিল? তাঁহাদের সহিত সেদিনও তাই কি

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।"

আমরা দেখিয়াছি সকল সাধক বৈষ্ণব কবিগণের শ্রীরাধাই অবশেষে কৃষ্ণ-চিন্তায় কৃষ্ণময়ী হইয়াছেন, তাঁহার আত্মা স্বরূপতঃ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও অংশরূপে আপনাকে পৃথকজ্ঞান করিয়া, পৃথকভাবে নিজ সত্তা অক্ষুন্ন রাখিয়া কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন। ইহাই প্রেমধর্ম্মের বিশেষত্ব।

বেদান্ত মতে সাধকের আত্মা জ্ঞানমার্গে বিবর্ত্ত লাভ করিয়া একেবারে নিজের সকল সত্তা হারাইয়া ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। আর তাঁহার কোনো পৃথক সত্তাই থাকে না।

বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন—প্রেমধর্ম্মের পথে সাধকের আত্মা পৃথক থাকিয়া প্রগাঢ় আনন্দে কৃষ্ণময় হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করে।

জ্ঞান-পথিক নশ্বর জগৎকে মায়াময় মনে করিয়া সৃষ্টিকে বাদ দিয়া স্রষ্টাকে লাভ করিতে চাহেন।

প্রেমপথিক বহির্জগৎকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় থাকিয়া বাহিরের জগৎ ভুলিয়া যান। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দময়। সেই আনন্দ হইতে তাঁহার অন্তরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদ্ভব হয়। তাহাতে প্রেমিকভক্তের মনে ক্রমে ক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে সেবা করিবার বাসনা জাগে। এই মধুর ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-সেবাই প্রেম-সাধনার পূর্ণ পরিণতি।

আমাদের আলোচ্যমান কবিগণ এই মধুর ভাবেই কৃষ্ণ সেবা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটি শ্রীরাধাসঙ্গিনী গোপী।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও অপরাপর বৈষ্ণবকবিগণ সাধারণ মানবজাতিকে এক চমৎকার মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা সমাজের সঙ্কীর্ণ অনুশাসনকে উপেক্ষা করিয়া, মানবের স্বরচিত নিয়ম জালকে ছিন্ন করিয়া, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, অনুষ্ঠান না মানিয়া জীবকে সহজ স্বভাব গতি দিয়া, ধর্ম্মজগতের সর্ব্বপ্রকার জটিলতা, সহস্রবিধ আচার অনুষ্ঠান ও নানাপ্রকারের অযথা আত্মনিগ্রহ ও আত্মনিপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহারা কামনাবিহীন পবিত্র প্রেম-সাধনায়, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে নরনারীর অবাধ মিলনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে পবিত্র মধুর প্রেমসাধনে বামদেবের ললাটাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হইয়া যায়, যে প্রেম ঈশ্বরমুখী, তাহার জন্য তাঁহারা কোনো বিধিনিষেধের বাধা মানেন নাই। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে যদি মন—কাম ক্রোধ, স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, বাসনা হইতে মুক্ত

না হয়, ব্রজগোপীর প্রেম কখনই অনুকরণীয় নহে। অনুকরণ করিতে গেলে শুধু সমাজদ্রোহিতাই হইবে।

তাঁহারা মানব অন্তরের সকল বন্ধন, সকল দাসত্ব, সকল সংস্কারের মুক্তিদাতা। ভবিষ্যৎ যাত্রীদের জন্য তাঁহারা প্রেমধর্ম্মপথ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহান্ উদার পথে যে প্রেমিক প্রেমিকা রাইএর মতই নিঃশঙ্কচিত্তে অভিসারে গমন করিতে পারিবেন, তিনিই চিরসুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ করিবেন!

তাঁহাদের পদাবলীর সঙ্গীতধারা চিরদিন সাধকভক্তের চক্ষে অশ্রুর উৎসধারা বহাইয়া, কবি-হৃদয়ে ভাবের বন্যা ছুটাইয়া, গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে মূর্চ্ছনা তুলিয়া, অনুর্ব্বর মানবমনকে চির সরস ও শ্যামময় করিয়া তুলিবে।

রূপরস-শব্দগন্ধ-স্পর্শের নিবিড় পরিবেষ্টনে চিরসুন্দরের অরূপ লীলা রূপবান হইয়া রসঘন প্রকাশ লাভ করিয়াছে পদাবলী-কাব্যে। বেদান্তের "অবাঙ্ মনসোগোচরম্" রূপবান হইয়া এই সব কবির কল্পনার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়াছে। তাঁহাদের কাব্যে শ্যামসুন্দর, অনন্তলীলাময়ের চিরসত্যোজ্জ্বল শাশ্বত প্রতীকরূপে বিরাজমান। ইহাই সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের, পক্ষে সার্ব্বভৌম পরম সত্য।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-কাব্যের মূল রাগিণী

রবীন্দ্র-কাব্য মানবাত্মার চিরন্তন বিরহের বাণী-রূপ। পূর্ণের সহিত জীবাত্মার যে বিচ্ছেদ সেই বিচ্ছেদ-বেদনার সাহিত্য-রূপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমগ্রতার বহুমুখী ধারাবাহিকতায় সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য ও আনন্দের মধ্যেও একটা গভীর বেদনার সুর অন্তর্নিহিত। বেদনার যমুনাকূলে যে নিত্যলীলা চলিতেছে সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে, সেই লীলার গানই রবীন্দ্রকাব্য।—জীবনের মরুপথে হারানো গান, হারানো সুর, হারানো স্বপ্নবিহ্বলতার স্মৃতির বেদনার রূপায়ণও এই রবীন্দ্র কাব্য। বৈচিত্র্যের লাখ লাখ স্রোতোরেখা কত আঁকাবাঁকা, বাঁকাচোরা ধারা পার হইয়া এই বেদনার-যমুনায় আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে।—"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে"—ইহাই তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রাণের কথা। তিনি কাব্যের ছলে সারাজীবন বৈষ্ণব কবিকুলের মতো চিরসুন্দরের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ-অঙ্কিত শ্রীরাধা তাঁহার জীবনে প্রকট। শ্রীরাধার মতই তাঁহার জীবনে ও কাব্যে চিরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ, অভিসার, মান, অভিমান, মিলন ও বিরহ প্রস্ফুটিত। তাই তাঁহার জীবন ও কাব্য আনন্দময় হইলেও বেদনার করুণ সুরে অনুপ্লাবিত। শ্যামের জন্য রাধার মনে যেমন স্বস্তি ছিল না—

> ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়
> মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়।

বর্ষার ঘনঘটার দিনে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এমনি উচাটন হইয়াছেন—ঝড়ের রাতে তিনি দুয়ার খুলিয়া প্রিয়তমের অভিসারের অপেক্ষায় সারারাত্রি দাঁড়াইয়া আছেন——

> —"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার—
> পরাণ সখা বন্ধু হে আমার,
> —আকাশ কাঁদে হতাশসম নাহি যে ঘুম নয়নে মম,
> দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাহি যে বারে বার,
> পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।"

বহু গানে, কবিতায় তিনি এই আবেগকে বাচ্যাতিশয়িনী ব্যঞ্জনায় রেখারূপ দিয়াছেন। তাঁহার বহু গান গভীর কারুণ্যে ভরা বেদনাঘন। রূপের লাবণ্যদ্যুতি, সৌন্দর্য্যের মাধুরী নিঙড়াইয়া তিনি বিশ্বদেবতার পূজা করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতির ও শরীরীর রূপলাবণ্যের লাবণ্যদ্যুতিটুকু লইয়া তিনি সাধনা করিয়াছেন। প্রকৃতির যে রূপজ্যোতিকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ, তাঁহার কাব্যমুখর গানে গানে তাহা গগনে, ভুবনে, তরুলতিকায় বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহার মধ্য দিয়াই সর্ব্বত্র চিরসুন্দরকে পূজা নিবেদন করিয়াছেন।

রূপ জাগায় প্রেরণা, রূপ যোগায় উপকরণ, রূপমাধুরী উদ্দীপ্ত করে অনুরাগ। বিশ্বপ্রকৃতির এই রূপ রবীন্দ্রনাথের মনে অনুরাগ জাগাইয়াছে চিরসুন্দরের প্রতি। আর কাব্যে, গানে তিনি তাঁহারই সাধনা করিয়া গিয়াছেন শ্রীরাধার মতো। রূপসৌন্দর্য্য তাঁহার মনে প্রশ্ন তুলিয়াছে—"কার কথা যেন মনে পড়ে, কার কথা কেউ জানে না, কোথায় তাকে দেখেছি, কি দেখিনি, কি যেন নাই, কিসের যেন অভাব"—এই আকিঞ্চন অজ্ঞাত রহস্যময়, বেদনায় ভরিয়া উঠিয়া তাঁহার শত শত গানে কবিতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটা অনির্দ্দিষ্ট অতৃপ্তির বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যেন বাণী রূপ পাইয়াছে নিখিল মানবহৃদয়েরও চিরন্তন বিরহ বেদনা। বরিষণের রিমিঝিমি, ঝিল্লির একটানা সুর, দাদুরী, ডাহুকীর কলস্বর, কোকিলের কুহুতান সব মিলিয়া তাঁহার কাব্যে একটা লীলামাধুরী আনিয়া দিয়াছে সত্য কিন্তু সে কাব্যে একটা চিরন্তন ক্রন্দনের সুর বিরাজমান। মনে যে উদাসব্যাকুলতা জাগিলে মানবাত্মা যুগে যুগে দেশে দেশে বলে—"পরম কাম্যকে না পাওয়া অবধি কি করিয়া প্রাণ ধারণ করি"—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও জীবনে তাহারই চিরন্তন রূপ।

প্রিয়তমকে পাওয়ার যে আকুতি, আর্ত্তি, আবেগ,—অতিলৌকিক আকুলতা, ইহা তাঁহার কাব্যে ও জীবনে ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া চরমে পৌঁছাইয়াছে। তাঁহার জীবনের ক্ষণের পর ক্ষণ বহিয়া গিয়াছে, বছরের পর বছর, প্রিয়তমের দেখা নাই, কাব্যে গানে সেই প্রতীক্ষার বেদনাদাহ তিনি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, তাঁহার জীবন, তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনা, বর্ষার গানগুলি—রূপ দিয়াছে মানবাত্মার চিরন্তন মিলন তৃষ্ণাকে, অনন্তের জন্য সান্তের রসাবেগ—Eternal yearning কে।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীরাধার অভিসারকে অবলম্বন করিয়া একটি কবিতায় বলিয়াছেন—

"তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নবনব পর্য্যায়
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে নিত্য পুষ্প,
নিত্য চন্দ্রালোকে,
নিত্যই সে একা, সেই ত একান্ত বিরহী।

যে অভিসারিকা তারই জয়। আনন্দে যে চলেছে
কাঁটা মাড়িয়ে।
সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ।
সে যে বাজায় বাঁশি প্রতীক্ষার বাঁশি
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে এক তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

এই রাধার অভিসারই আমরা বলি রবীন্দ্র-জীবন, রবীন্দ্র-কাব্য। তিনি চলিয়াছেন অভিসারে, তাঁহার কাব্য চলিয়াছে অভিসারের এই যাত্রার ছন্দে, অভিসারিকা রূপে চিরসুন্দর—সমুদ্রের পানে। আর সেই পরম সুন্দর দুলিতেছে আহ্বানের সুরে। প্রতীক্ষার বংশীধ্বনি তার আগাইয়া চলিয়াছে অন্ধকারের পথে।

এই চিরন্তন অভিসার-লীলাই তাঁহার জীবনে তাঁহার কাব্যে ওতপ্রোত। নিত্য-অনিত্য, অসীম-সসীম, পূর্ণ-অপূর্ণের মিলন-তৃষ্ণা সেথায় সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নরনারীর প্রাকৃত অনুরাগ, মিলন, সম্ভোগ বিরহের মধ্যেই আত্মসত্তা বিলোপ, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন, সকল বন্ধন ছেদন, সর্ব্বসংস্কার-মুক্তি, সব্ব বাধাবিঘ্ন বিজয়ের একটা নিগূঢ় আবেদন আছে এবং কারুণ্যরসের ভিতর দিয়া জীবাত্মার অজানা অনন্তের জন্য চিরন্তন ব্যাকুলতার ছবি চিত্রিত হইয়াছে। মানব অন্তরে যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা ও অ-স্বতন্ত্রতার বেদনা এবং প্রাকৃত ভালোবাসার উর্দ্ধে যে অতিপ্রাকৃত প্রেমের তৃষ্ণা তারই গানের সুরধুনী ইহাতে চির প্রবহমানা বলিয়াই তাঁহার সাহিত্য লোকোত্তরতা ও অমরত্ব লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় বলি ইহা সেই মোহমন্ত্র গান যাহা কবির গভীর প্রাণে চিরবিরহের ভাবনা জাগাইয়া তোলে। অজানা অনন্তের তৃষ্ণাকে বিশ্বকবি মানবাত্মার "চির-বিরহিণী নারী" বলিয়াছেন।

কহিলাম তারে তুমি চাও কারে ওগো বিরহিণী নারী
সে কহিল আমি যারে চাই, তার নাম না কহিতে পারি।

এই "চির-বিরহিণী নারী"ই তিনি স্বয়ং, আর তাঁহার কাম্য, তাঁহার সাধনা, সেই অজানা অনন্ত চিরসুন্দর। তাঁহার কাব্য তাঁহারই প্রতিচ্ছবি। কারুণ্যই তাহার মূল রাগিণী।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বজনীন কবিগণের অন্যতম। তিনি সবকালের, সবযুগের কবি। তিনি আত্মলব্ধ দ্রষ্টা, ঋষি। তিনি তাহার চেয়েও বড়, তিনি চিরসুন্দরের পরম সাধক, বৈষ্ণব কবিগণের অঙ্কিত শ্রীরাধার মত। শ্রীরাধার মতই তাঁহার জীবনে, কাব্যে, গানে চিরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ, অভিসার, মান, অভিমান, বিরহ-বেদনা প্রস্ফুটিত। বেদনার যমুনাকূলে সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে যে নিত্যলীলা চলিতেছে তাহারই প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে। জীবনের মরুপথে যত হারানো গান, হারানো সুর, হারানো স্বপ্নবিহ্বলতার স্মৃতির রূপায়ণও হইয়াছে তাঁহার কাব্যে ও জীবনে। পূর্ণের সহিত অপূর্ণের অসীমের সহিত সীমার মিলন রূপই তাঁহার সাহিত্য।

তাঁহার কাব্যের সমগ্রতার বহুমুখী ধারাবাহিকতায় সুখ, দুঃখ, হাসি, অশ্রু ও বেদনা আনন্দের বৈচিত্র্য। বেদনার মধ্যে আনন্দ, আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ ওতপ্রোত। সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মধ্যে একটা গভীর বেদনারসুর অন্তর্নিহিত। মানুষের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন সব লোকোত্তর কবি আসেন, যাঁহারা কেবল সাহিত্যে, কাব্যে, গানে নূতন প্রবর্ত্তনা দিয়াই ক্ষান্ত হন না, মানব ইতিহাসকে নূতন পথে চলিতে প্রেরণা দান করেন। তাঁহাদের বাদ দিলে জগতকে, মানবের সমগ্র ইতিহাসকে ভাবিতেই পারা যায় না। তাঁহারাই প্রকৃত মহাকবি। ভারতে বাল্মীকি ব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, গ্রীসে হোমার, রোমে ভার্জিল, ইতালীতে দান্তে, ইংলণ্ডে শেক্সপীয়ার, জার্মাণীতে গ্যেটে এবং রাশিয়ার টলষ্টয়—মানবের ইতিহাসের রথচক্র পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এইসব কবিই প্রকৃত মহাকবি। তাঁহাদের বাদ দিলে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস খণ্ডিত। সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া মানুষের যে বিচিত্র ও ব্যাপক পরিচয় তাহার সমস্তটা জুড়িয়া তাঁহাদের জীবনবেদী। এই অর্থে নব্যভারত ও নব্যজগতের একমাত্র মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে হিমালয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাহিত্যকে মহাভারত ও হিমালয়ের সহিত তুলনা করিতে পারি। হিমালয়ের তুষার মৌলি শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া রহস্যময়ী গঙ্গা যেমন নানা-পথে, নানাভঙ্গীতে বিচরণ করিয়া সমস্ত উত্তরাপথ বেড়িয়া "তমালতালীবন-রাজি নীলা" বেলাভূমিতে পড়িয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি উত্তরাখণ্ডে জন্ম লইয়া সারা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ভারত পরিক্রমা করিয়া

পৃথিবীর সকল দেশ বিচরণ করিয়া তাঁহার জীবন ও সাহিত্য চিরসুন্দর-সমুদ্রে লীন করিয়াছেন। গঙ্গার চেয়েও তাঁহার বিস্তারের পরিধি বহু পরিমাণে অধিক।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাহিত্য ঋষিগণের বেদ উপনিষদের বাণী হইতে (Inspiration) প্রেরণা পাইয়া, কালিদাস ভবভূতির যুগের এবং বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যধারা হইতে রসপুষ্ট হইয়া বিশ্বসাহিত্য হইতে ধনরত্ন আহরণ করিয়া একটা নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে নূতন ভাবে নবসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বিশ্ববাসীকে বিতরণ করিয়াছে। বিশ্ববাসী তাহার রসে পুষ্ট হইয়া আনন্দে আত্মহারা।

কোন স্মরণাতীত যুগে, কোন আদিকালে ঋষিগণ অভয় দিয়া বিশ্বকে শুনাইয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—"

রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, কবিতায় আমরা সে বাণীর নূতন ব্যাখ্যা (Interpretation) পাই। কবে কোন যুগে কোন আরণ্যকের স্নিগ্ধছায়ায় যজ্ঞবেদীমূলে ঋষিগণ, সাম, উপনিষদ, দর্শন শুনাইয়াছেন তাহারও উদাত্ত ধ্বনি আমরা পাই রবীন্দ্রসাহিত্যে। ক্রৌঞ্চমিথুনের-তমসাতীরে যেখানে মহাকবি বাল্মিকী অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন, আমরা দেখি সেই অশ্রুধারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মূর্ত্ত হইতে।

আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথকে কখন জ্ঞানবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শী বুদ্ধের পার্শ্বে আনন্দ-ঘনরূপে, কখন দেখি আত্মভোলা ফকির বাউলের বেশে একতারা হাতে, কখন দেখি বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় রাজকবি কালিদাসের পার্শ্বচর হিসাবে, কখন দেখি স্বদেশের বিদেশের গরীব দুঃখীর দুঃখ শোকে সান্ত্বনারত, অথচ সবমায়ামুক্ত, সকলবন্ধনবিমুক্ত উদাসী মহাপাগল কবির মত—সকল সুখ দুঃখের অতীত।

তিনি চিরভাস্বর, মৃত্যুঞ্জয়। আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তিতে সমুজ্জ্বল। তিনি তাহার চেয়েও মহতোমহীয়ান—তিনি লোকে লোকে চিরপূজিত হইবার যোগ্য।

ইতালীর দান্তে এবং জার্মাণীর গ্যেটে বিশ্ব-সাহিত্যে এমন সব সম্পদ দান করিয়াছেন যাহা বিশ্ববাসীকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরও উপরে। তাঁহার জীবন ও সাহিত্য বিশ্ববাসীকে যে কতদূর তুলিয়া ধরিয়াছে তাহা ধারণাতীত। ইটালী ও জার্মাণী ছিন্নভিন্ন ছিল, দান্তে ও গ্যেটে তাহাদের অখণ্ড করেন। অখণ্ড ইতালী অখণ্ড জার্মাণী দান্তে ও গ্যেটের সৃষ্টি। ভারতের অখণ্ডতা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তবু বলি এসব বাহ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সাধক, চিরসুন্দরের চিরন্তন পূজারী। তাহাতেই তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত।

শ্যামের জন্য রাধার মনে যেমন স্বস্তি ছিল না—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়—

রবীন্দ্রনাথও চিরসুন্দরকে পাইবার জন্য চিরচকিত, চির উন্মুখ। বহু গানে, কবিতায় তিনি এই ভাবটি বাচ্যাতিশয়িনী ব্যঞ্জনায় রূপ দিয়াছেন। তিনি যেন সদাই শোনেন চিরসুন্দরের আহ্বান—

"দূর সঙে তুহুঁ বাঁশি বাজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি,
রাধা রাধা রাধা।"

তিনি বলেন অনুনয় করিয়া—

"ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।"

তিনি বলেন—

"গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু, সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূতি ধরি
পন্থ দেখায়ব মোর।"

রূপের লাবণ্যদ্যুতি, সৌন্দর্য্যের মাধুরী নিঙড়াইয়া তিনি সেই বিশ্ব দেবতার সারাজীবন পূজা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির রূপলাবণ্যের লাবণ্য—দ্যুতিটুকু তিনি নিঙড়াইয়া লইয়া সেই উপচার দিয়া চিরসুন্দরের পায়ে নিবেদন করিয়া সাধনা করিয়াছেন। রূপের দ্যুতি জাগায় প্রেরণা, রূপাভা যোগায় উপকরণ, রূপের মাধুরী উদ্দীপ্ত করে অনুরাগ। এই রূপদ্যুতি জাগাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অনুরাগ চিরসুন্দরের প্রতি। আর কাব্য, গান দিয়া তিনি ইহাদের সহায়ে শ্যাম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধা ভাবে পরিপূর্ণ আবিষ্ট হইয়া বিশিষ্ট ভক্তরূপে। এই রূপদ্যুতি তাঁহার মনকে বিশ্ব স্বষ্টির গোড়ার কথায় লইয়া গিয়াছে। মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—"কে আমি, কোথা হ'তে এসেছি, কেন এসেছি, কি আমার কাজ, কোথায় যেতে হবে, কার কথা যেন মনে পড়ে, কার কথা কেউ জানে না, কোথায় যেন তাকে দেখেছি, কি দেখিনি কোথাও, কি যেন

তার নাই, কিসের যেন অভাব, এই আকিঞ্চন,—অজ্ঞাত রহস্যময় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়া তাঁহার শত শত গানের ধারায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটা অনির্দ্দিষ্ট অতৃপ্তির বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া ইহাতে যেন বাণীরূপ পাইয়াছে নিখিল মানব হৃদয়ের চিরন্তন বিরহ। বরিষণের রিমঝিমি, ঝিল্লির একটানা সুর, দাদুরী, ডাহুকীর কলস্বর, কোকিলের কুহুতান, পাপিয়ার "পিউ কাঁহা" সব মিলিয়া তাঁহার সাহিত্যে একটা লীলা মাধুরী আনিয়া দিয়াছে।

মনে যে উদাস ব্যাকুলতা জাগিছে মানবাত্মা যুগে যুগে দেশে দেশে বলে—পরম কাম্যকে না পাওয়া অবধি কি করিয়া প্রাণধারণ করি—রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে তাহারই সমষ্টিগত প্রতিধ্বনি ও চিরন্তন রূপ বিরাজমান।

প্রিয়তমকে পাওয়ার যে আকুতি, আর্ত্তি, আবেগ, অতিলৌকিক আকুলতা তাঁহার কাব্য ও জীবন তাহারই প্রতীক। জীবনে ক্ষণের পর ক্ষণ বহিয়া গিয়াছে, প্রিয়তমের দেখা নাই, তাঁহার কাব্যে, গানে, জীবনে সেই প্রতীক্ষার বেদনাদাহ। তাঁহার জীবন, কাব্য, গান রূপ দিয়াছে—মানবাত্মার চিরন্তন মিলনতৃষ্ণাকে—অনন্তের জন্য সান্তের রসাবেগ—Eternal yearning.

রবীন্দ্রনাথ শ্রীরাধার অভিসারকে অবলম্বন করিয়া একটি কবিতায় বলিয়াছেন—

"তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নবনব পর্য্যায়
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে নিত্য পুষ্প,
নিত্য চন্দ্রালোকে,
নিত্যই সে একা, সেই ত একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়। আনন্দে যে চলেছে
কাঁটা মাড়িয়ে।
সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ।
সে যে বাজায় বাঁশি প্রতীক্ষার বাঁশি
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে এক তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

এই রাধার অভিসারই রবীন্দ্র জীবনের ও কাব্যের চিরন্তন অভিসার। তিনি যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাব্য চলিয়াছে—এই যাত্রার ছন্দে, অভিসারিকারূপে চিরন্তন কাল ধরিয়া চিরসুন্দর সমুদ্রের পানে। আর সেই পরমসুন্দর দুলিতেছে আহ্বানের সুরে চিরকাল ধরিয়া দূরে দূরে সরিয়া গিয়া। এই লীলাখেলা জীবাত্মা ও পরমাত্মায় চলিতেছে অনন্ত দিন। প্রতীক্ষার আহ্বানের

বংশীধ্বনি নিত্যই সর্বক্ষণ বাজিতেছে। সেই অনাহত ধ্বনি শুনিয়া আগাইবার পথ ঘোর অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন, কুটিল।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নরনারীর প্রাকৃত অনুরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ সবই আছে। তবে এসবের মধ্যে আছে আত্মসত্তাবিলোপ, সর্বস্ব বিসর্জন—গোপিগণের মত, সকল বন্ধন ছেদন, সর্ব্বসংস্কার মুক্তি, সর্ব্ববাধাবিঘ্ন বিজয়ের একটা নিগূঢ় আবেদন। এবং কারুণ্যরসের ভিতর দিয়া জীবাত্মার অজানা অন্তরের জন্য চিরন্তন ব্যাকুলতার ছবি চিত্রিত হইয়া আছে। মানব অন্তরের যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা ও অস্বতন্ত্রতার বেদনা এবং প্রাকৃত ভালবাসার ঊর্দ্ধে যে অতিপ্রাকৃত প্রেমের তৃষা তাহারই গানের সুরধুনী তাঁহার কাব্যে চিরপ্রবহমাণ বলিয়াই তাঁহার সাহিত্য অমর ও সকল জগত সাহিত্যের ঊর্দ্ধে। তিনি কান্ত-ভালবাসাকে রাধাকান্ত-প্রেমের সহিত সংযোগ সাধন করেন, সীমার প্রাকৃত ভালবাসাকে অসীমের প্রেমে লইয়া যান তাঁহার কাব্য সাধনা দ্বারা, তাই তিনি এ যুগের শুধু মহাকবি নহেন, মহর্ষিও। মহাকবি, মহর্ষি সর্ব্বকালের। রবীন্দ্রনাথ চির-সুন্দরের আকর্ষণে এমনি দিশাহারা যে তিনি নিজেকে শ্রীরাধার মত চিরবিরহিণী নারীবেশে সাজাইয়াছেন। চিরসুন্দরের প্রতি অনন্ত তৃষ্ণাকে তিনি মানবাত্মার "চিরবিরহিণী নারী" বলিয়াছেন।

"কহিলাম তারে তুমি চাও কারে ওগো বিরহিণী নারী
সে কহিল, আমি যারে চাই তার নাম না কহিতে পারি।"

এই "চিরবিরহিণী" নারীই তিনি স্বয়ং আর তাঁহার আকুল কামনা, তাঁহার নিগূঢ় সাধনার বস্তু, সেই অজানা অনন্ত চিরসুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে সীমার কোটি হইতে অসীমের কোটিতে পেঁছাইয়াছিলেন। সীমা অসীমের মিলনকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া তিনি সৃষ্টিকে দেখিয়াছেন। তাঁর এই ভাস্বর দৃষ্টির পূর্ণতার বশে মানব, প্রকৃতি, সারাবিশ্ব তাঁহার নিকট পূর্ণতর রূপে আভাসিত হইয়া নবতর রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং এই চরম দৃষ্টিই তাঁহাকে চিরসুন্দরকে দেখাইয়াছে ও তাঁহার সঙ্গ দিয়াছে।

তাই তিনি নিজে সীমিত হইলেও, তাঁহার কাব্য তাঁহার গানগুলি, তাঁহার স্বীয় জীবন অসীমের সঙ্গে লীলারঙ্গে মাতিতে পারিয়াছে। তাই তিনি আত্ম-উপলব্ধির সহিত বলিয়াছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ—
তাই এত মধুর।।

কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।।
তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলই যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইত ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।।

তখন সারা সৃষ্টিই রূপের লীলায় ভরপুর। চতুর্দ্দিকে লীলাখেলার রূপজ্যোতি —রাগ রসময়ের রসলীলা। সারাসৃষ্টির মাঝেই তিনি অসীমকে দেখিতেছেন। রূপের মধ্যে অরূপের প্রকাশ দেখেন, রসের মধ্যে বিরাটের অন্তর উপলব্ধি করেন, গন্ধের মধ্যে তিনি পান শ্যাম অঙ্গের কুঙ্কুম-চন্দন সুবাস, শব্দের মাঝে শোনেন কানুর বাঁশরীর গুঞ্জন, কোনো কিছুর স্পর্শেই তিনি অনুভব করেন শ্যাম অঙ্গের পরশ, তাই তিনি মুগ্ধভাবে তাঁর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া নিজেকে ভাবেন তিনিই যেন চিরসুন্দরের প্রিয়তমা "বিনোদিনী রাধা"।

তিনি আত্মহারা হইয়া গাহিয়া উঠেন—

"হৃদয় কমল তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল—
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।।"

ইহা সেই রাধার মতই আত্মসমর্পণ,—
চিরসুন্দরের শ্রীপাদ পদ্মে।